অগ্নিবন্যা

আশাপূর্ণা দেবী

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ ১৩৭১ সন
প্রকাশিকা
দোলা মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ শিল্পী
শ্রীগণেশ বসু
হাওড়া-৪
ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯।

অফুরন্ত কালপ্রবাহের স্রোতে

অন্তরঙ্গ

বাড়িতে তিনতলায় কোনো ঘর ছিল না, সম্প্রতি নতুন একখানা বানানো হয়েছে, বলতে পারা যায় গৌতম স্পেশাল প্রায় চারদিকই খোলা, আর সবদিকেই আড়েদীর্ঘে বৃহৎ বৃহৎ একটা করে জানলা বসানো, যার ফলে ঘরটাকে যেন হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যায়। মা কখনো কোনো সময় হাঁফাতে হাঁফাতে উঠে আসতে পারলে মেজেয় পা ছড়িয়ে বসে পড়ে বলে, আঃ! তোর ঘরটা যেন জাহাজের ডেক রে গৌতম ঠিক সমুদ্দুরের হাওয়া বয়।

মা কখনো জাহাজের ডেক দেখেছে কি না অথবা সমুদ্দুরের হাওয়া খেয়েছে কিনা জানা নেই গৌতমের, তবু মা ওই কথাই বলে। গৌতম বলে, আমার ঘর মানে? ঘর তো তোমারি মাদার। দয়া করে এই অধম পুত্তুর-টাকে থাকতে দিয়েছ, তাই সুখ করছি।

মা বলে, হাড় জ্বালিয়ে ছাড়া কথা কইতে জানিস না তুই!

তা ওটা হয়তো গৌতমের মুদ্রাদোষ, অন্যের হাড় জ্বালিয়ে মজা পাওয়া। তবে 'সুখ করা' কথাটা সত্যি। শুয়ে সুখ আছে ঘরটায়। সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন এই ঘরটায় উঠে এসে গৌতমের মনে হয়, যেন কলকাতার বাইরে কোথায় চলে এসেছে। লোড্‌শেডিং হলে তো (যেটা রোজ রাতেই হয়) আরোই মনে হয়। চারিদিক মধুর অন্ধকারে ডুবে যায়, অথচ অকস্মাৎ পাখার ঘুরুনি থেমে গেলেও মাথা ঘুরতে শুরু করে না। মায়ের ভাষায় ঘরে 'সমুদ্দুরের হাওয়া'। বিশেষ করে এখন, এই সময়। মা বলে ভালসময় ঘরটা হয়েছে। চৈত্রবৈশাখ হাওয়ার মাস!

চৈত্রবৈশাখরা কখন আসে-যায় গৌতমের ঠিক খেয়াল নেই, তবে খেয়াল আছে এখন এপ্রিল চলছে। তার মানে এপ্রিলটা হাওয়ার মাস।... বিশেষ করে ভোরের সময়। চারদিক থেকে হাওয়া এসে এসে যেন গায়ের উপর ভালবাসার হাত বুলিয়ে দিয়ে যায়। কিন্তু সব গোলাপেই কাঁটা, সব মধুতেই হুল, ভাবলো গৌতম, রবিবারের সকালের আমেজময় ঘুম-

টাকে সাতসকালে খোয়াতে বসে। আজকাল কী তাড়াতাড়ি আকাশে আলো ফোটেরে বাবা! আর আকাশে ফোটা মানেই তো চোখে ফোটা!

ঘুমচোখে বালিশের তলা থেকে ঘড়িটা বার করে তেরছা চোখে একবার দেখে নিলো, মাই গড্! মাত্র চারটে পঁয়তাল্লিশ! ব্যাপার কী, বন্ধ হয়ে বসে আছে না কি? চোখ থেকে সরিয়ে কানের ওপর ধরলো ঘড়িকে।

না তো! টিক টিক্ তো করেই চলেছে।

তার মানে ওই চারটে পঁয়তাল্লিশই! অথচ—

এখনি ঘর দিব্যি আলো আলো হয়ে গেছে, একটু পরেই আলোয় ভরে যাবে। ··কিন্তু? কিন্তু আমি এখনো অন্তত পুরো চারটি ঘণ্টা ঘুমোবো। সংকল্প করলো গৌতম।

দেখা যাচ্ছে এই শেষরাত্রেই কারেন্ট অফ হয়ে বসে আছে।

অতএব জানলার পাল্লাদের বন্ধ করে দিয়ে, দিন কে রাত করে ফেলার কৌশল খাটানো যাবে না।

অথচ ছুটির দিনটাকে তারিয়ে উপভোগ করতে আর কি উৎকৃষ্টতর উপায় আছে সকালের ঘুমটাকে যতটা সম্ভব টেনে লম্বা করে নিয়ে গিয়ে দিনটাকে ছোট করে ফেলা ছাড়া? গৌতমের অন্তত এর থেকে উৎকৃষ্টতর কোনো উপায় জানা নেই ছুটি উপভোগের। বাবার মতো তো 'পাগল' নয় সে।

বাবার ছুটির দিনের পদ্ধতি হচ্ছে, সেই দিনেই অধিক ভোরে উঠে পড়া, এবং সারা সপ্তাহের জমানো নানাবিধ বিচিত্র সব খুঁটিনাটি কাগজগুলো নিয়ে বসা। এমনও দেখা গেছে—সারা সপ্তাহ খবরের কাগজগুলো ভালো-করে পড়া হয় না বলে, সাতদিনের জমানো কাগজগুলোও বাবা তন্নতন্ন করে পড়তে গুছিয়ে নিয়ে বসেছে। আরো কত কী-ই সব করে নিয়ে বাজারে যায়। আর বৃহৎ থলিতে বয়ে নিয়ে আসে তাদের পেট ফাটো ফাটো অবস্থা করে তুলে। এইসব বাবদই বাবাকে 'স্ক্রু ঢিলে' হেড্ অফিসে গোলমাল ইত্যাদি বলে থাকে গৌতম।

তবে একটা সুবিধে বাবার ছুটির দিনের সঙ্গে গৌতমের ছুটির সংঘর্ষ ঘট-বার বিপদ নেই। গৌতমের ব্যাঙ্কের চাকরি সংসারের আর দশজনের

মতোই, ছুটির হিসেব। বাবা দ্বিজোত্তমের ছুটি একটা বেমক্কা দিনে। সপ্তাহের ওঁচা দিন বুধবার হচ্ছে ইঞ্জিনীয়ার দ্বিজোত্তম বোসের ছুটির বার। বিদ্যে-সাধ্যি থাকলে কি হবে, আর উচ্চপদস্থ হলেই বা কি হবে, অফিসটা হচ্ছে কারখানার, আর প্রতিদিন হাজিরা দিতে হয় শহর ছাড়িয়ে এক শিল্পাঞ্চলে। অফিসের গাড়ি অবশ্য আসে কিন্তু কখন আসে ? জানা নেই গৌতমের। বুধবার ছাড়া সকালে ঘুম ভেঙে উঠে কোনোদিনই বাবাকে দেখতে পায় না সে। শুনেছে—বাবাকে ঠিক ছটার সময় 'শালখে'য় সেই কারখানার গেট-এ গিয়ে পৌঁছতে হয়।

উঃ ! ভাবা যায় না।

কিন্তু বন্ধ চোখের পাতাতেও আলোর আভাস লাগলে ঘুমের বিঘ্ন ঘটে এই এক অসুবিধে গৌতমের। কী আর করা—মাথার তলা থেকে বালিশ-টাকে টেনে নিয়ে চোখের উপর চাপা দিয়ে, ঘণ্টাচারেকের সংকল্প নিয়ে পাশ ফিরল গৌতম। দিনকে রাত করার এও এক কৌশল।···কিন্তু কে ভেবেছিল মিনিট কয়েক পরেই রুবি হুড়মুড়িয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে গৌতমের 'সংকল্পের' ওপর হাতুড়ি বসিয়ে দিয়ে বলে উঠতে আসবে। এই ছোড়দা, হয়েছে ! আর পড়ে থাকতে হবে না। ঘুমের তেরোটা বেজে গেল তোর। এই ভোর সকালে তোর সেই পাজী বন্ধুটা এসে ডাকাডাকি করছে তোকে।

পাজী বন্ধু !

রেগেটেগে বালিশ চাপার মধ্যে থেকেই খিঁচিয়ে ওঠে গৌতম, দিলি তো ছুটির ভোরটা মাটি করে ? যা বেরো দূর হয়ে যা। আমার কোনো পাজী বন্ধু নেই।

না নেই !

রুবিও ভেঙিয়ে বলে, তোর বন্ধুরা সব গুণের অবতার ! এই সময় যে লোক ভদ্রলোকের বাড়িতে এসে কলিংবেল ঠুকে বাড়ির লোকের ঘুম ভাঙিয়ে বন্ধুকে ডাকতে আসে, তাকে পাজী বলবো না তো কি মহা-মানব বলবো ? হুঃ ! বাবা হেন মানুষও না বলে পারেন নি, কী সব বন্ধু

গৌতমের ! এই কি বেড়াতে আসার সময় ? আশ্চর্য !

বালিশটা চোখ থেকে সরাতে হলো।

বাবা কখনো কারো সম্পর্কে মন্তব্য করেছে অথবা অন্যের ব্যাপারে নাক গলিয়েছে, এ দৃষ্টান্ত বিরল। উঠে বসে বলে উঠলো গৌতম, বাবা বাড়ি আছে এখনো ?

এখনো আছেন ! এক্ষুনি বেরোবেন। গাড়ি এসে গেছে।

গৌতম খাটের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে কড়াগলায় বললো, পাজীটা আর দু-মিনিট পরে আসতে পারলো না ?

ছোড়দা ! দেখলি ?

কী দেখলাম ?

নিজেও 'পাজী' বললি।

ঠিকই বলেছি। কোন্ উল্লুকটা এসেছে ? নাম বলেছে ?

কে জিগ্যেস করতে গেছে ? দেখিও নি। বাবা বললো রুবি গৌতমকে ডেকে দিগে—মরতে মরতে আসতে হলো।

বেশ ! চমৎকার ! ধর কোনো মার্ডারার এই ভাবে ডেকে নিয়ে গেল, আর যাওয়ামাত্র ঘ্যাচকরে পেটের মধ্যে একখানা ছোরা ঢুকিয়ে দিলো !

আঃ ছোড়দা, সকালবেলা অপয়া অপয়া কথা বলবি না বলছি। আমি আর একবার শুতে যাচ্ছি, ঘুমিয়ে পড়লে দুঃস্বপ্ন দেখবো।···বললাম না তোর সেই পাজী বন্ধুটা। হাড় কুচ্ছিত হাড়গিলের মতো চেহারা ঠাঙার মতো ঢ্যাঙ্গা। আগে তো কতই আসতো।

গৌতম খাটের তলায় রাখা চটিটার মধ্যে পা ঢুকিয়ে, আলনা থেকে তোয়ালেটা নিয়ে বাথরুমের দিকে এগোচ্ছিল, ঘাড় ফিরিয়ে বললো, তবে যে বললি দেখিসই নি।

ওই বারান্দা থেকে একবার চোখ ফেলেছিলাম ! এ সময় কে জ্বালাতে এলো দেখতে।···তা তুই কি ভাবছিস যে বাবা তোর থেকে বোকা ? না বুঝে সুঝে ঘরে ডেকে নিয়ে বসাবেন ?

গৌতম ভাবল তা ঠিক ! ভাবতে চেষ্টা করল, কে হতে পারে ? কে আছে

তার হাড়গিলের মতো চেহারার বন্ধু? রুবির কথাটা ফ্যালনা নয়। তাদের বিচক্ষণ বাবা—না দেখেশুনে কাউকে ঘরে বসাবে না। যাই হোক মুখটা তো ধুয়ে আসি।

ঘরের সঙ্গেই অ্যাটাচড্ বাথরুম, গৌতমের ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি স্মরণ করে। রুবি যার জন্যে রেগে রেগে বলে, রাম না হতেই রামায়ণ!

এখন রুবি ওর পিছনে একটা হুকুম ছুঁড়ে দিলো বেশী দেরি করবি না বলছি, মহাশয় ব্যক্তিটি বসতে চাইছিলেন না রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন, বাবা বললেন, বন্ধু তো ঘুমোচ্ছে, ডেকে তুলতে সময় লাগবে—যাকগে আমি কিন্তু আবার ঘুমোতে যাচ্ছি।

চলে গেল হুড়মুড়িয়ে।

কিন্তু ঘুমোতেই গেল কী?

গৌতম ব্রাশে টুথপেষ্ট লাগাতে লাগাতে মনে মনে হাসল, যাচ্ছিস তো বসবার ঘরের ওপর নজর পাততে! যা তোমার কৌতূহল সিস্টার চিরদিনই আমার বন্ধুদের নাড়িনক্ষত্র আমার থেকে তুমি বেশী জানো।

গৌতমের পক্ষে যতটা শীগগির সম্ভব, ততটা শীগগির নেমে এসেছিল, তবু ততক্ষণে চিত্ততোষ অস্থির হয়ে উঠে পড়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেখে গৌতমও বেরিয়ে এলো। এখন তো যথেষ্ট আলো ফুটেছে, চিত্ততোষের সেই চিরপরিচিত অস্থির ভঙ্গিটা চোখে পড়ল। এই ভঙ্গিটাই চিত্ততোষ। সব সময়ই যেন ভয়ঙ্কর কোনো একটা জরুরি কাজ ওকে তাড়া করে ফিরছে।

গৌতম অবাক গলায় বললো, তুই? আর রুবি বললো—

'রুবি' নামটা সর্বজনবিদিত। চিত্ত গৌতমের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে বললো, কী বললো রুবি?

থাক, সে আর তোর শুনে কাজ নেই।

বুঝেছি কী বলেছে। ওসবে আমি কেয়ার করি না। তো—এতক্ষণ লাগলো তোর ঘুম ভাঙতে?

বাঃ ! শুধুই ঘুম ভাঙতে না কি ? মুখ-টুখ ধুতে হবে না ?

তা বটে। চিত্তর স্বর কঠোর কঠিন। তা সাবান পাউডার সেন্ট এসবের পর্ব মিটেছে ?

মারবো থাপ্পড় ! কী বাজে বাজে বকছিস !···গৌতম বললো, দীর্ঘ বিরতির পর হঠাৎ এই মিড্‌নাইটে উদয় হবার হেতু ?

মিড্‌নাইট !

তাছাড়া আবার কী ? এখনো চারঘন্টা ঘুমোতাম !

হুঁ। তোমার মতো নাড়ুগোপালের মুখে অবশ্য এই কথাটাই মানায় অথচ—

আচ্ছা আচ্ছা ভেতরে এসে বসবি আয়, শুনি কী ব্যাপার !

চিত্ত গম্ভীর ভাবে বললো, আর ভেতরে গিয়ে বসবার সময় নেই। যেতে যেতে বলবো—

যেতে যেতে ?

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে গৌতমের।

এরকম আচমকা কোথায় আবার যেতে হবে রে বাবা ! অথচ চিত্ত যখন একবার কথাটা ঘোষণা করেছে, যেতে হবেই অবধারিত। জানে তো চিত্তকে। এবং এই রাস্তা থেকেই যেতে হবে সেটাও প্রায় অবধারিত। তবু অনেকদিন পরে দেখা, স্বভাবটা কিছু পাল্টাতেও পারে।

সেই আশায় তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, তা এককাপ চাও তো খেতে হবে রে বাবা ! ওটা তো সেরে এসেছিস বলে মনে হচ্ছে না। তবে ইত্যবসরে যদি বিয়ে করে থাকিস তো আলাদা--

থাম। বাজে কথা রাখ। একদিন সকালে চা না খেলে মানুষ মরে না। নষ্ট করার মতো সময় নেই !

তা আমাকেও একটু খেতে দিবি না শালা ?

না খেলে মৃত্যু অবধারিত ?

প্রায়।

বলে হাসে গৌতম।

গুলি মারো এমন বদ অভ্যাসে। ঠিক আছে কোনো চুলোয় ভাঁড়ের চা খেয়েই প্রাণ বাঁচাস।

চিত্ত প্রায় ক্ষিপ্ত।

নাঃ! গৌতমের আজ আর ছাড়ান নেই।

তবু গৌতম যাকে বলে 'করুণ বচন' সেইভাবে বলে। তার থেকে এক বারটি ঢুকে আয় না বাবা। দু'মিনিটের ব্যাপার। ফাদারের জন্যে অনেক-ক্ষণ আগেই রান্নাঘর চালু হয়ে গেছে। আশা করছি চা রেডি।

তোর বাবাকে তো একটু আগে অফিসকারে চেপে চলে যেতে দেখলাম।

দেখলি!

গৌতম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, বাঁচা গেল! তবে চলে আয় প্লীজ্—

চিত্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, ছোটলোকের মতো কথা কেন? বাঁচা গেল মানে?

না মানে ব্যাপারটা তোকে ঠিক বোঝাতে পারব না। ভদ্রলোক বাড়িতে থাকলেই আমি কেমন আনইজি ফীল করি। যাক চলে আয় কুইক!

না!

চিত্ত আর একবার ওর দিকে কঠোর দৃষ্টি হেনে বলল, চায়ের জন্যে জীবন-মরণ, দেখলে মেজাজ খারাপ হয়ে যায় আমার। যাবি কি যাবি না বলে দে ব্যস।

চিত্ত পা চালাতে শুরু করে।

আঃ! এই চিত্ত কী হচ্ছে?···গৌতম বলে উঠলো বাড়িতে একবার বলে আসতে দিবি তো?

বলতে হবে না। তোর বোন কোথাও না কোথাও কান পেতে বসে আছে। খুব সম্ভব! তবু মাকে বলে না এলে চেঁচামেচি লাগাবে। মানে আঘাত লাগবে তো?

ওই ছুতোয় নিজের প্রাণটাও বাঁচিয়ে আসবি বোধহয়!

ধ্যেৎ! কী যে বলিস? তোকে বাদ দিয়ে? যাবো আর আসবো। কিন্তু ভাই—

গৌতম লজ্জা লজ্জা ভঙ্গিতে গালে একটু হাত বুলিয়ে বলে, দাড়িটা একটু কামাতে দিবি না ? আর জামাটা একটু পালটাতে—

চিত্ত উল্টোমুখো হয়েছিল, ঘুরে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় বলল, যখন তোর নিজের বৌকে পোড়াতে শ্মশানে যাবি, তখন ভালো করে সেভ করে লক্ষ্ণৌ-চিকনের পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে যাস।

গৌতম একটু থমকালো।

এ আবার কোন্ ব্যাপারের সঙ্কেত ?

তবে এও ভাবলো, না ঘাবড়ালেও চলবে, চিত্তর কথার ধরনই এইরকম। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয় পরিচিত যে কারুর সম্পর্কে ও অনায়াসে বলতে পারে যে, তাকে কোথায় পাবি ? এই তো সকালে তাকে পুড়িয়ে এলাম।

কোনো বন্ধু কিছুদিন আড্ডায় অনুপস্থিত হচ্ছে দেখে সে বিষয়ে কথা হচ্ছে চিত্ত ফট্ করে বলে উঠলো, 'আসছে না কেন ?' এই নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস ? শুনিস নি কিছু ?

না তো ! কেউ তো কিছু শোনে নি। কী হয়েছে তার ?

চিত্ত হঠাৎ ভারী বিষণ্ণ হয়ে গেছে, না শুনে থাকিস তো, নাই বা শুনলি।

কিন্তু তা তো হয় না। না শুনে কে ছাড়ে ? শোনা হয়।

শিউড়ি না সোমড়া কোথায় যেন গিয়েছিল সে পিসির ছেলে না মাসির মেয়ের বিয়েতে, সেই রাত্তিরেই কলেরায়—

স্তব্ধ হয়ে গেছে সবাই, স্তম্ভিত হয়ে থেকেছে কতক্ষণ, তারপর প্রশ্ন উঠেছে চিত্ত কোথা থেকে খবর পেল !···তার উত্তরে কড়া ধিক্কারবাণী। বন্ধুর মরণ বাঁচনের খবর কি খবরের কাগজে পড়ে জানতে হয় ? না রেডিও শুনে ? যোগাযোগ রাখতে হয়।

পরে যখন সেই বন্ধু এসে হাজির হয়েছে চিত্ত বিনা লজ্জায় বলে উঠেছে, মরিস নি ? আশ্চর্য ! মরাই উচিত ছিল তোর। লজ্জা থাকে তো ট্রাম লাইনে গলা পাতগে যা। জলজ্যান্ত বেঁচে থেকে তুই বাইশদিন আড্ডায় আসিস নি ! ছিঃ !

এই স্বভাব চিত্তর। বেশ কিছুকাল দেখাসাক্ষাৎ না হলেই চিত্ত তাকে

খরচের খাতায় ফেলে দেয়। বলে, তোদের কি ধারণা শালা এখনো বেঁচে আছে? ওদের বাড়ির লোক আমাদের দু'চক্ষে দেখতে পারে না বলেই কাঁধ দিতে ডাকে নি।

তবে বেশ কিছুকাল চিত্ত নিজেই নো-পাত্তা হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ আজ এই অসময়ে আকস্মিক আবির্ভাব। গৌতমকে এই ভোর সকালে ছড়িয়ে বার করে নিয়ে যাবার চেষ্টার কারণটা কি না বুঝলেও, ওই 'পোড়ানো' শব্দটায় তেমন শিহরিত হলো না।···আক্ষেপের ভান করে বলল হায়! পোড়াতে নিয়ে যাবার মতোও যদি একটা বৌ জুটতো!···সে যাক, আমরা কি তাহলে কারো বৌকে পোড়াতে যাচ্ছি?

যা ইচ্ছে ভাবতে পারিস। তবে জামা পাল্টানো, দাড়ি কামানো, এসব সৌখিন ইচ্ছে ত্যাগ করো মানিক। মাকে বলে আসতে হয় তো যাও এক মিনটের জন্যে। আমি এগোচ্ছি। হ্যাঁ ভালো কথা বেশী করে কিছু টাকা সঙ্গে নে।

টাকা! ঠিক আছে। কী আশ্চর্য! এই একটা মিনিট দাঁড়া! কোন্ দিকে এগোলি ফিরে এসে জানতে পারবো? যা তোর হাঁটা। ছেলেবেলার মতো দৌড় রেস দেব?

চিত্ত দাঁড়ালো। প্যান্টের পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করলো। অন্য পকেট থেকে একটা দেশলাই। বার করেই কানের কাছে তুলে ধরে নেড়ে দেখে রাস্তায় ফেলে দিয়ে জুতোর চাপে পিষে ফেলেই, হঠাৎ চমকে উঠে হেঁট হয়ে সেই খালি বাক্সটা থেকেই একটা তলাভাঙা কাঠি বার করে নিয়ে হাত আড়াল করে সিগারেটটা ধরিয়ে বেজার গলায় বললো, ছটার ট্রেনটা তো গেল। দেখা যাক বাসে যাওয়া যায় কিনা। এসপ্লানেড থেকে অনেক বাসটাস ছাড়ে—

ট্রেন হারানো। বাস ধরা।

তার মানে অন্তত এই দণ্ডে শ্মশানে যেতে হচ্ছে না। কিন্তু কোথায় যেতে হচ্ছে তাও তো বলছে না।

বলবেও না।

গৌতমের জানা আছে। ছাত্রজীবনে হঠাৎ হঠাৎই এরকম কাজ করিয়ে নিতে বাধ্য করতো চিত্ত। হয়তো বা কলেজে ঢোকবার মুখে বলে উঠলো, এই ঢুকতে হবে না—বেরিয়ে আয়।

বেরিয়ে আসবো?

হ্যাঁ! হ্যাঁ! কী হবে বাজে বাজে কতকগুলো মুখস্থ বুলি কপচানো শুনে? ফরনাথিং সময় নষ্ট। চলে আয়।

অমোঘ আদেশ!

চলে তো এলাম, কিন্তু যাবো কোথায়?

ধরে নে জাহান্নামে।

আশ্চর্য! যেতেই হতো। ভিতরে প্রবল অনিচ্ছা নিয়েও কেন কে জানে গৌতম ঠিকই চিত্ততোষ সেন নামের ছেলেটার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসতো।

এমন অনেকদিনই দেখা গেছে কলেজের দারোয়ানের কাছে খাতাপত্র গচ্ছিত রেখে গৌতম বোস নামের আরামপ্রিয় ছেলেটা কড়া রোদ্দুরে চিত্ত ঘোষের পিছুপিছু হাওড়া কি শেয়ালদা কোনো একটা স্টেশনে গিয়ে হাজির হয়েছে।

প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে যা ছিল মুঠোয় ভরে বার করে নিয়ে হাত ছড়িয়ে গুণে নিতে নিতে বলে উঠতো চিত্ত, তোর কাছে কী আছে রে?

আমার কাছে? বিশেষ কিছুই তো—

গৌতমও প্যান্টের পকেট তল্লাস করে হয়তো বলতো মাত্র সাতটাকা পঞ্চাশ—

এনাফ্! ওতেই হবে, ফেরা হবে। আমারতো আরো কম।

আর তারপর অনায়াসে টিকিটের কাউন্টারের সামনের লম্বা কিউ ভেদ করে কেমন করেই যেন কিউর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে কাউন্টারের মধ্যে হাত গলিয়ে বলতো এই পয়সায় দুজনে কতদূর পর্যন্ত যাওয়া যায় মশাই বলুন তো?

এরকম প্রশ্নের মধুর উত্তর আশা করা যায় না, প্রায়ই বিরক্ত উত্তর আসতো,

কোথায় যাবেন সেটাই বলুন না ?

গন্তব্যস্থল বলে কিছু নেই—

খেঁকিয়ে প্রশ্ন, কী নেই ?

মানে বিশেষ কোনো যাবার জায়গা নেই। জাস্ট একটু বেরিয়ে পড়া। এই টাকার মধ্যে দুটো টিকিট দিয়ে দিন যেদিকের হোক।

তবু কাজ হতো না। টিকিটবাবু দেওয়ালে টাঙানো নোটিশ বোর্ড দেখতে দেখতে, মাইল পিছু কত ভাড়া সেটা জেনে নিতে বলতো নোটিশ থেকে। অবশেষে হয়ত একটা ব্যবস্থা। একবার শুধু এক টিকিটবাবু তেরছা চোখে তাকিয়ে ব্যঙ্গের গলায় বলে উঠেছিল, হঠাৎ দেবদাস শ্রীকান্তর যুগ থেকে খসে পড়েছেন না কি মশাই ? সে যুগ আর নেই বুঝলেন ? ওতে আর কেউ কাবু হয় না এখন।

টিকিট নিয়ে বেরিয়ে আসবার পর গৌতম বলেছিল, হলো তো ? কেমন একখানা থাপ্পড় ঝাড়ল।

চিত্ত হেসে উঠে বলেছিল, ওটাই তো মজা ! থাপ্পড় খুঁজতেই তো বেরোনো ! একসপিরিয়েন্স জমছে।

ক্লাশ কামাই করে এমন অদ্ভুত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মধ্যে কোনো মজা খুঁজে পেত না গৌতম, তবু আশ্চর্য, চিত্তর প্রভাব থেকে মুক্ত হতেও পারতো না। সে যখনি জোর দিয়ে বলতো, 'কী বোকার মতো বসে বসে কতক-গুলো বকবকানি শুনবি ? বেরিয়ে আয় 'উল্লুক—' নিরুপায়ের নিশ্বাস ফেলে বেরিয়েই আসতো গৌতম।

পরে অনেক সময় ভেবেছে গৌতম কেন আমি নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করি ! আর এরকম বোকামি করব না। ডাকতে এলে সোজা বলে দেবো তোর ইচ্ছে হয় যা শালা, আমি যাচ্ছি না। তোদের বংশে কেউ কখনো গ্র্যাজুয়েট নেই, তুই প্রথম গ্র্যাজুয়েট হচ্ছিস, যেমন তেমন করে পাশ করতে পারলেই চলে যাবে। আমার তো তা নয়, রেজাল্ট ভালো করতে না পারলে বাড়িতে মুখ দেখাতে পারবো না। আর ভবিষ্যতের বারোটা বেজে যাবে।

কিন্তু ভেবেছে ওই মনে মনেই।

আর চিত্ত ডাক দেওয়ামাত্রই ভবিতব্যের হাতে আত্মসমর্পণের মতো নিজেকে ওর হাতে নিক্ষেপ করেছে।

তারপর সারাদিন ওর সঙ্গে রোদে ঘুরেছে, মেঠো রাস্তায় হেঁটে হেঁটে পায়ে ব্যথা ধরিয়েছে আর জুতোর তলা ক্ষইয়েছে। বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি অজ পাড়াগেঁয়ে মাছিওড়া, ময়রার দোকানে বসে তেলেভাজা জিলিপি আর টকটক রসগোল্লা খেয়েছে, ইস্টিশানের খোড়োচালার চায়ের দোকানে নিমপাতার পাঁচন 'চা' খেয়েছে, এবং দিনশেষে যতটা সম্ভব কম পয়সায় বাড়ি ফেরার জন্য যতটা সম্ভব কষ্ট করেছে।

ফিরে এসে প্রত্যেকবারই মনে মনে কানমুলতো গৌতম উঃ। এই শেষ! আর নয়!···কী অবস্থা মাথা ধরে জ্বর হয়ে উঠেছে গা-হাত-পায়ে ব্যথা, সারিডন কি নোভালজিন্ খেতে হয়েছে, আর তার সঙ্গে মায়ের বকুনি খেতে হয়েছে অফুরন্ত।

বাবার কাছ থেকে অবশ্য কখনো নয়।

মা নিজে বকেছে যত পেরেছে, কিন্তু বাবার চোখ থেকে যথাসাধ্য আড়াল করেছে ছেলেকে। বাবার সামনে দশঘণ্টা বেড়িয়ে আসা ছেলের সম্বন্ধে অনায়াসে হালকা গলায় বলেছে, এতক্ষণে আসা হলো বাবুর? কোন্‌কালে বেরিয়েছিলি।···তবুও ক্লাশ কামাইয়ের ঘটনাটা মাকে সবদিন বলতে পারতো না গৌতম। মা ধিক্কার দিত। বলতো, বন্ধু কি তোর আপিসের 'বস্' না মন্তরের গুরু? সে যা বলবে শুনতে হবে? টিকি ধরে টান দিলেই যেতে হবে? লজ্জা পেয়েছে গৌতম কিন্তু লাভ কিছু হয় নি, এমনও হয়েছে কোনোদিন ছুটির বারে সকালবেলাই এসে ডেকেছে—মা বলেছে, ওমা সেকি! এখন বেরোচ্ছিস ফিরবি কখন?

গৌতম তখন চিত্তর তীব্র ইচ্ছার কবলে কবলিত, তাই বলেছে, ঠিক নেই। তোমরা খেয়ে নিও।

সে আবার কী! খাবি কোথায়?

সে যা হয় হবে।

এ আবার কী কথা! ওই বেআক্কেলে বাউণ্ডুলে বন্ধুটা যে কোথা থেকে জুটল ছাই!

তখন গৌতম রেগে উঠেছে, মাকে বকেছে। অথচ মনে মনে যেন চিত্তর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে।···অদ্ভুত একটা মানসিকতায় চলেছে তখন গৌতম।

কিন্তু যখন কলকাতা থেকে মাত্র মাইলকয়েক দূরে কোনো এক অজ পাড়া-গেঁয়ে গিয়ে পড়তো? চিত্তর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে? তখন কি আর সেই বিদ্রোহ থাকতো? তা তো ঠিক বলা যায় না।···তখন তো অন্য একরকম গভীর অনুভূতির স্বাদে চিত্তকে নিজের থেকে অনেক বড় অনেক উঁচু মনে হয়েছে। চিত্তর জানার জগতের পরিধি, চিত্তর দেশ আর দেশের দারিদ্র মানুষ সম্পর্কে তীব্র চেতনা, সমাজ ব্যবস্থার অপরিসীম অবিচারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রোশ, শোষণ শোষক আর শোষিতদের নিয়ে অগ্নিগর্ভ আলোচনা, দেখে আর শুনে নিজেকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে হয়েছে গৌতমের।··· সে যেন এক মন্ত্রমুগ্ধ গৌতম।

ঘুরতে ঘুরতে চিত্ত বুঝিয়েছে গ্রামের দারিদ্র্য কত ভয়াবহ বস্তু! দেখিয়েছে কী সামান্য, কত যৎসামান্য উপকরণে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে এরা তাও জোটে না। কিছু মোটা চাল, একটুকরো ন্যাকড়া কি গামছা, আর মাথার উপর একটু খড়, এইটুকু থাকলেই এরা ভাবে 'সব আছে।'···

অথচ—চিত্ত তীব্রভাষায় বক্তৃতা করেছে—গ্রামের এই নিরন্ন মানুষদের শ্রমের ফসলেই শহরের মানুষ গাড়ি চড়ে, ডানলোপিলোর গদিতে শোয়, আর—খেয়ে উপছে ডাষ্টবীনে ফেলে।·· সিনেমার পর্দায় দারিদ্র্যের ছবি দেখে 'আহা' করেই আমাদের কর্তব্য শেষ হয় অথবা বলি, দেশের অবস্থা এতটা উদঘাটিত করা ঠিক নয়, বিদেশীরা দেখবে!

অভিভূত গৌতম তখন ভেবেছে, উঃ! চিত্ত কত জানে। অথচ চিত্তদের সাতপুরুষে নাকি ব্যবসাদার। চিত্ত যাদের সমাজের শত্রু বলে মনে করে। চিত্ত একটা আশ্চর্য!

চিত্তর প্রতি তাই তখন কৃতজ্ঞও হয়েছে গৌতম নামের ক্লাশ পালানো

ছেলেটা। ভাগ্যিস জোর করে টেনে এনেছিল, তাই না এত জানতে আর বুঝতে পারলো গৌতম। গৌতমের চিত্তলোকের একটা বন্ধ জানলা খুলে দিচ্ছে চিত্ত।

অথচ কিছুদিন পরেই আবার যখন চিত্ত কোথাও যেতে ডেকেছে তখন গৌতম আতঙ্কিত হয়েছে, অস্বস্তিবোধ করেছে। এ-যেন অদ্ভুত একটা টানা-পোড়েনের খেলা।

তাই বলে চিত্ত যে একেবারেই ভেসে যেতো তা নয়। কয়েকজন তার বিশেষ প্রিয় অধ্যাপক ছিলেন, চিত্ত তাঁদের ক্লাশে অনুপস্থিত থাকার কথা ভাবতেই পারতো না। এবং দেখা যেত পরীক্ষার রেজাল্টে তার নাম প্রথম সারিতে। যদিও সকলেই জানতো—চিত্তর কাছে ভাল রেজাল্ট তো দূরের কথা পাশফেলেরই কোনো পার্থক্য নেই। ফেল করলেও কিছু এসে যাবে না ওর।

বন্ধুরা বলেছে, সারাক্ষণ তো ভূতের শাশুড়ীর শ্রাদ্ধর খাটুনি খেটে বেড়াস, পড়িস কখন রে রাস্কেল?

চিত্ত উত্তর দিয়েছে পড়ার জন্যে অনেকটা সময় দিতে হবে, এটা একটা কুসংস্কার।

বাজে কথা রাখ। কত রাত অবধি পড়িস? না কি হোল্ নাইট?

তাহলেই হয়েছে। রাত্তির সাড়ে দশটা বাজলেই বাড়ির মেন সুইচ অফ।

অ্যাঁ।

হ্যাঁ জ্যাঠামশাইয়ের মতে সৃষ্টিকর্তা রাতটাকে সৃষ্টি করেছেন কাজের জন্যে নয় ঘুমের জন্যে। নচেৎ ইচ্ছে করলে তো তিনি চব্বিশঘণ্টাই সূর্যি ব্যাটাকে খাটিয়ে মারতে পারতেন। রাত বলে কিছু থাকতো না, শুধু দিনই থাকতো।

এম এ-তে ফার্স্ট ক্লাশ সেকেণ্ড পেয়েছিল চিত্ত, কিন্তু সে খবর পাবার আগেই চিত্ত হঠাৎ হাওয়া হয়ে গেছল। চিত্তকে কোথাও দেখা যায় না।

টেঁশলো না কি?

আরে ছি ছি। অসুখ-টসুখ করেছে হয়তো। যদিও চিত্তকে কেউ কোনো-দিন অসুখে পড়তে দেখে নি। তবু মানুষের শরীর তো। যা এলোপাথাড়ি

ঘোরে।

গৌতমের এনার্জি কম, বলল ওর একটা ফোন নম্বর আছে না।

ধুত্তোর ফোন্ নম্বর। ওর বাড়িটা তো কলকাতার মধ্যেই না কি?

জগদীশ আর সুব্রত চিত্তর বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল। তবে রেজাল্ট যা পেয়েছিল ধারণার বাইরে।

চিত্তর কাকা বলেছিল, অসুখ? ও ছেলের অসুখ করবে? ওকে আজ কবর দিলে কাল সেই মাটি ফুঁড়ে গাছ গজাবে।

চিত্তর বাবা বলেছিলেন, খবর? সেটা তো তোমাদেরই জানবার কথা। তোমরা তার বন্ধু।

'বন্ধু' শব্দটা এমন করে উচ্চারণ করেছিলেন, যেন এরা ওঁর ছেলের মাথাটা চিবিয়ে খেয়ে শেষ করে দোষ ঢাকতে ন্যাকামি করে খবর নিতে এসেছে।

তবু এরা বোকার মতো বলে ফেলেছিল, জানলে আর খবর নিতে আসবো কেন? বাড়ির লোককে জানিয়ে যায় নি? কোথায় যেতে পারে?

ঝুটঝামেলা কথা বাড়াচ্ছ কেন বাপু? 'কোথায় যেতে পারে' এককথায় এর উত্তর হয়?

জগদীশের না কি মুখে এসেছিল, 'আপনাদের ছেলে। নিখোঁজ হয়ে গেল খোঁজ করবেন না?' কিন্তু করা হয় নি, ঠিক সেই সময় হঠাৎ চিত্তর জ্যাঠা-মশাই ঘরে ঢুকে এসে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিলেন ওর কাছে বুঝি কিছু পাওনা-টাওনা আছে তোমাদের?

কী বিশ্রী মফস্বলী মফস্বলী ধরন লোকটার।

তা শুধু ওঁর কেন সবকটারই।

জগদীশ যতদূর দেখেছে বুঝেছে যে সংসারে কর্তাকর্তা বুড়োধাড়ি ভাইয়েরা একত্র থাকে, আর তাদের মধ্যে গলাগলি ভাব, তারা কখনো সভ্য হয় না। মফস্বলীভাব থাকবেই তাদের। যাক্‌গে মরুকগে, তবে কখনো বিরক্তি-কর তাই এরা বিরক্ত গলাতেই বলল, পাওনা মানে?

তা ধার কর্জ করে থাকতে পারে তোমাদের কাছে। কত পাওনা আছে?

উপযুক্ত প্রমাণ দাখিল করতে পার তো মিটিয়ে দেওয়া যাবে।

ওরা ভারী অপমানবোধ করেছিল।

কড়া চোখে তাকিয়ে বলেছিল, টাকা পাওনা না থাকলে, বন্ধু-বন্ধুর খোঁজ নিতে আসে না?

কথাটা সুব্রত বলেছিল। সুব্রত আগে কোনো কথা বলে নি। কিন্তু বললো ভঙ্গিটা কড়া করে।

জ্যাঠামশাই কিন্তু বিচলিত হন নি। তেমনি চিবিয়ে চিবিয়েই বলেছিলেন, আসে বুঝি? জানা ছিল না।

চমৎকার!

দুজনেই ধিক্কারের গলায় বলেছিল, আপনাদের জানা জগতের ধারণা তাহলে এই?

জ্যাঠামশাই মধুর গলায় বলেছিলেন, তাছাড়া কি? আর জানা জগতের ছাড়া অজানা জগতের কথা বলবো কি করে বাপু?

ওরা ফিরে এসে বলেছিল, গেট-এ বাঘের মতো একটা কুকুর বাঁধা, তাই আর কিছু বললাম না, নাহলে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়ে আসতাম বুড়ো ঘুঘুকে। বলা যায় না ঝপ করে বাঘার চেনটা খুলে দিতে পারে · মনে হলো খবর জানে। বলবে না।

গৌতম ভেবেছিল ভাগ্যিস আমিও ওদের সঙ্গে যাই নি।···

তারপর গৌতম ব্যাঙ্কের এই চাকরিটা পেয়ে গিয়েছিল। পেতে বেগ পেতে হয় নি, খুঁটির জোর ছিল।

অতঃপর গৌতমের জন্যে তিনতলায় এই ঘরখানা বানানো হয়েছে। এবং কনে খোঁজা হচ্ছে। মাঝে মাঝেই রুবি মারফত খবরটবর কানে আসে। তবে মনের মতো মেয়ে না কি বিশ্বভুবনে নেই। মা বলেছে আমার চোখে একটু ধরলে তবে তো গৌতমকে দেখতে বলবো! তা একটাও তো চোখে ধরছে না।

এই সব ঝামেলায় চিত্ততোষ নামের অস্তিত্বটা গৌতমের মন থেকে প্রায় মুছেই গিয়েছিল। হঠাৎ এই অশনিপাত।

অথচ এখন এই মুহূর্তে সেই ছাত্রজীবনের মতোই নিরুপায়ের ভূমিকা নিয়ে আত্মসমর্পণ করে ফেলা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছে না গৌতম।

সেই তখন-তখন যে রুবি বলতো 'তোর ওই বন্ধুটা নির্ঘাৎ যাদুমন্তর জানে ছোড়দা। নইলে ওকে দেখলেই তুই বোকা হয়ে যাস কেন?' সে কথাটার নিশ্চয় কোনো ভিৎ আছে। সত্যি তীব্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও এমন অদ্ভুত আত্মসমর্পণ কেন?

মাকে বলার সময় মনে মনে বলল, শালা উল্লুক, নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলি বেঁচেছিলাম! আবার উদয় হতে এলি কেন?···

মুখে বলল, তোমরা বসে থেকো না, খেয়ে নিও, কখন ফিরবো ঠিক নেই।

মায়ের হাঁ মুখ বুজতেই চায় না। এই এখন ভোরবেলা বেরোচ্ছিস, আর আমাদের খেয়ে নিতে বলছিস?

তাই তো বলছি।

বলি যাচ্ছিস কোথায়?

জানি না।

ওমা! কী সর্বনেশে কথা, পুলিস-টুলিশ আসে নি তো?

রুবি বলল, তোমার মাথাখানা ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখার মতো মা। পুলিসের কথাও মনে পড়ল তোমার? ছোড়দার সেই পাজী বন্ধুটা এসেছে আবার এতদিন পরে।

এ-কথাটা অবশ্য সহ্য করল না গৌতম।

বললো, মারবো চাঁটি! বড় সাহস বেড়ে গেছে না?

ঠিক আছে বলব না। তা চা-টা খেয়ে যাবি তো?

সময় হবে না।

ও ছোড়দা দোহাই তোর পায়ে পড়ি। এক মিনিট—

না না! চললাম।

চলে এলো গৌতম বেজার মনে।

সত্যি, চা না খেয়ে বাড়ি থেকে বেরোনোর কথা ভাবতে পারে কেউ?

চলে আসতে আসতে শুনতে পেলো রুবি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললো, দেখো

মা কব্জা করে ফেলার মতো লোক শীগগির না আনলে, তোমার এই ছোট ছেলেটার আদায় থাকবে না।

মা বললো, তাহলে তো আরোই আদায় থাকবে। হুঁঃ। বড় ছেলেকে দিয়েই হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছি।

মার জবাবটা অবশ্য শুনতে পেল না গৌতম।

বড় ছেলে প্রতি শনিবার সন্ধ্যাবেলা বৌ নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যায়, ফেরে রবিবারের সন্ধ্যেয়।

মা বলে, 'শনিপুজো দিতে যাচ্ছে তোদের 'বড়দা।'

এসপ্ল্যানেড থেকে বাস ছেড়ে কতখানিটা যেন গিয়েই যে হঠাৎ এমন গ্রাম গ্রাম গন্ধ এসে যেতে পারে এটা এখন প্রায় ভুলেই গিয়েছিল গৌতম। কলকাতার কত কাছে এখনো ছড়ানো ছিটোনো আছে ঝোপ-জঙ্গল খানা-ডোবা। হঠাৎ চট করে চোখে পড়ে যায় পুকুরঘাট থেকে উঠে আসছে কলসী কাঁখে বৌ, হ্যাট হ্যাট করে গরু তাড়াচ্ছে থানপরা শুঁটকি বিধবা। গরুর পাল নয়, একটা গরু। হাড়-পাঁজরা সার। তবু হয়তো বা ওই গরুটা থেকে বুড়ির অন্ন সংস্থান হয়। যেটুকু দুধ হয় তাতেই জল ঢেলেঢেলে কলকাতার দরে বেচে, আর মাঠে জঙ্গলে চরিয়ে খরচা কমায়।···অথবা কোনো গেরস্থবাড়ির বুড়ি মা পিসি, সংসারের মূলকেন্দ্রটার দখল হাত থেকে খশেপড়েছে তাই এই সব আদাড়ে কাজগুলো করে বেড়িয়ে নিজের প্রয়োজনীয়তা বজায় রাখতে চেষ্টা করে।

গৌতমের ঢুলুনি আসছে, এর মধ্যে থেকেই কানে এলো ট্র্যানজিসটারে গান হচ্ছে।···কোথায় বাজছে? বাসের মধ্যেই, না কি বাইরে রাস্তায় টাস্তায়।

রাস্তাতেই, বোধহয় ধারে-পাশে কোনো চায়ের দোকানে।···মিলিয়ে গেল শব্দটা। গান কখন হয়?

হিন্দি গান? কটা বেজেছে?···শয়তানটা ঘড়িটা পর্যন্ত নেবার সময় দিল না। পাশের লোকটাকে কি জিগ্যেস করবে গৌতম, মশাই কটা বেজেছে?

নাঃ। যদিও লোকটার হাতে একটা ঘড়ি বাঁধা রয়েছে, কিন্তু লোকটার পরনে একটা ময়লা পায়জামা আর ততধিক ময়লা একটা রং জ্বলা হাফশার্ট। কোলের ওপর তারের জালের চুপড়িতে একচুপড়ি ডিম।···

এতক্ষণ গৌতম বাসের সমস্তটা লক্ষ্য করে দেখল। সহযাত্রীরা প্রায় সকলেই একই শ্রেণীর। দু'একজন মাত্র মেয়েলোক। (হ্যাঁ মেয়েলোক ছাড়া আর কোনো বিশেষণ মনে এলো না গৌতমের।)

ওই আবোল-তাবোল করে পরা ভাঁজভাঙা লাট খাওয়া ছাপা শাড়ি জড়ানো আধাবুড়িদের কি গৌতম 'মহিলা' বলবে?

নিজেকে খুব বিড়ম্বিত মনে হলো গৌতমের। যেন এদের সঙ্গে একাসনে বসে ওর প্রেসটিজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভাগ্যিস কোনো চেনা লোক নেই।

আমরা কোথায় যাচ্ছি?

চিত্তর মুখ জানলার বাইরে।

গৌতম আর একটু জোরে বলল। এই চিত্ত, কোথায় যাচ্ছি আমরা?

চিত্ত এখন মুখ ফেরাল। গৌতমকে একবার দেখে নিয়ে বলল, বলেছি তো জাহান্নামে।

বেশ! উত্তম জায়গা।

বলে গৌতম হাই তুলল।

সেই ট্র্যানজিসটার বাজা টিনের চালা চায়ের দোকানটাকে মনে পড়ল।···

একটা মাঝারিনামের ও মাঝারিদামের নার্সিং হোমের সামনে গেট-এ ঢোকবার মুখে সুব্রত আর জগদীশের প্রায় কপালে শিঙ বেরোবার অবস্থায় মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। জগদীশ বেরোচ্ছে সুব্রত ঢুকছে। স্বাভাবিক নিয়মে দুজনের মুখ থেকেই একই সঙ্গে একটি শব্দই উচ্চারিত হলো, তুই! এখানে?

জগদীশ একটু ছ্যাবলা হাসি হেসে বলল, আর কেন! কৃতকর্মের ফল।

কিন্তু তোর তো—

আমার কথা রাখ—

সুব্রত কঠোর গলায় বললো, ক'দিন আগে যেন তোর বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে এলাম ?

জগদীশ ভান দেখিয়ে মাথা চুলকোলো, এত হ্যানস্থা করিস না ভাই, 'ক-মাস' বল ?

বলতে ঘেন্না আসছে।

কাঁটায় কাঁটায় ঠিক আছে কিন্তু ভাই। ইয়ে তোরা নেমন্তন্ন খেয়েছিস এগারই আগস্ট, আর গত পরশু ছিল—

থাম, চুপ কর রাস্কেল। এ-যুগে যে এরকম গাড়োল থাকে তা জানতাম না।

জগদীশ ফের মাথা চুলকোনোর ভান করে বলে, বৌও ওই কথাই বলেছে—

ওঃ! তিনি বোধহয় এইমাত্র পৃথিবীতে পড়েছেন ?

সুব্রতর স্বর আরো কঠোর।

জগদীশ বলল, ওই তো মজা! ওঁরা সব সময় ইনোসেন্টের রোল প্লে করে যান। যাকগে যা হয়ে গেছে গেছে, তুই তো আর মানে তোর তো আর—

আমার কথা বাদ দে।

এসেছিস তো দেখছি কোনো সীক্রেট নাকি ?

আবার ছ্যাবলা হাসি হাসে জগদীশ।

ঘুষি মেরে নাক ফাটিয়ে দেব।

দে, তাই দে। কথার জবাব দেওয়ার থেকে সেটাই যদি সোজা হয়—

সুব্রত বলল, অসভ্যর মতো কথা বলিস কেন ? এসেছি জননীর তাড়নায়। মামাতো দিদি রয়েছে কী একটা অপারেশন কেস। অনেক দিন নার্সিং হোমে আছে। মা বকাবকি করছে। বলছে এ যুগের আমরা না কি মানবিকতা বা মনুষ্যত্বের ধার ধারি না, কর্তব্যবোধের বালাই নেই—

জগদীশ বললো, তাহলে তুই ততক্ষণ কর্তব্য সেরে আয়, আমি এই একটা ওষুধ নিয়ে আসি।

সুব্রত থমকে বলল, ওঃ! তুই আবার এসে ঢুকবি ?

বাঃ! ঢুকবো না? ঘন্টাবাজতে তো দেরী রয়েছে। বাজবার পর তুজনে একসঙ্গেই বেরোবো।

একটু ব্যস্ত ভঙ্গি জগদীশের।

সুব্রত বললো, তুই থাকিস বাবা ঘন্টাবাজার অপেক্ষায় আমি জাস্ট একবার দেখা করেই কেটে পড়ব।

জগদীশ খুব নিরীহ গলায় বললো, কী বললি? মামাতো 'দিদি'? ওঃ! বুড়ি বুঝি?

বুড়ি? কে বলেছে? আমার থেকে বছর তিন চারেকের বড় মাত্র।

জগদীশ ব্যগ্রগলায় বললো, তবে 'বোর' লাগবার কিছু নেই ভাই, এটুকু সময় ম্যানেজ করে ফেল। অনেক কথা আছে যেতে যেতে হবে। সেই তো বিয়ের সময় শেষ দেখা। আমারও আর আড্ডায় যাওয়া হয়ে ওঠে নি, তুইও বোধহয়—

আমি 'বোধহয়' কী জন্যে?

সুব্রত বললো, তোদের মতো উচ্ছন্নে গেছি আমি? আশ্চর্য! যে কটা ফাঁসির দড়ি গলায় পরলো, সব কটাই খতম হলো!

তা' ফাঁসির দড়ি গলায় পরা মানেই তো মরা-রে সুব্রত!···যাক থাকবি নিশ্চয়। এই এলাম বলে—

ব্যস্তভঙ্গিতে চলে গেল জগদীশ ডাক্তারের দেওয়া প্রেসকৃপশনটা হাতে নিয়ে। বেশী দামী নার্সিং হোমে রাখতে আসে নি বৌকে, যাতে সামর্থ্যের বেশী না হয়ে যায়। কিন্তু এখন দেখছে হরেদরে হাঁটু জল। ওষুধ পথ্যে এটায় ওটায় রাশিরাশি টাকা উড়ে যাচ্ছে। অথচ গোলমেলে কেস নয়, সাধারণই। ডাক্তারের তারিখ নির্দেশের ভুলে দিন তিনেক আগে এসে পড়ায় মেয়াদটা বেড়ে গেছে বেচারী শিখার। শিখা তাই রেগে রেগে বলে, ভুল না হাতী! ইচ্ছাকৃত ভুল নির্ঘাৎ নার্সিং হোমের সঙ্গে ব্যবস্থা আছে।

জগদীশ চলে গেলে সুব্রত মনে মনে একটু হাসলো। ভাবলো 'শেষ দেখা' কথাটা ঠিকই বলেছিস রাস্কেল! সেই গত এগার আগস্টই তোর শেষ

হয়ে গেছে। এখন যেটা ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটা জগদীশ সরকারের প্রেতাত্মা। ···প্রেতাত্মার সঙ্গে আর কী গল্প হবে যাদু? তোমার মধ্যে যে 'অনেক কথা' ছট্‌ফটাচ্ছে। সে তো স্রেফ বৌয়ের ন্যাকাকি পাকামি আর গদ-গদানি! শুনলে আমার ব্রেনের মধ্যে টিউমার গজিয়ে যাবে। আমি মিলিদিকে একবার দেখেই কেটে পড়ছি বাবা! তুমি তো ঘণ্টা বাজার পরও একসটেনশান নিয়ে গিন্নীর মুখশশী দেখবে। আমায় জড়ানো কেন বাবা? আমি স্রেফ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু—

রুম নম্বর মিলিয়ে পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকে এলো। রোগিণীকে খাটের স্প্রীং ঘুরিয়ে আধা উঁচু করে রাখা হয়েছে, বুক অবধি চাদর ঢাকা। ভিতরে বোধহয় শুধু লম্বা ধরনের একটা সেমিজ পরা। রোগা রোগা ফ্যাকাসে ফর্সা হাত দুখানা বুকের ওপর জড়ো করা।

পর্দা সরানোর সঙ্গে সঙ্গেই হাত দুটো একটু তুলে বলতে যাচ্ছিল 'নম-স্কার', বলতে হলো না। ক্ষীণ স্বরটাকে যতটা সম্ভব চড়িয়ে বলে উঠল তুই। মনে পড়েছে তাহলে?

সুব্রত ঢুকেই সামনে রাখা চেয়ারে বসে পড়ে বললো, যাক চিনতে পেরেছ তাহলে?

তার মানে সুব্রত যা সংকল্প করছিল তা হলো না। 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক-বার দেখে যাওয়ার' চিন্তাটা এখন খুব লজ্জার বলে মনে হলো ···বস্তুতঃ নার্সিং হোমের এই ঘরের ভিতরের পরিবেশটা চট করে মনকে পাল্টে দিতে পারে। দিলোও তাই। কাঁচের জানলায় পর্দা ফেলা আধো অন্ধকার ঘর, রোগজনোচিত খাট, ওষুধ ওষুধ গন্ধ মনটাকে কেমন দুর্বল করে দেয়। ···মিলিদিকেও অদ্ভুত লাগছে। মিলিদির হাত দুটো এমন খালি ছিল না কি? তা-তো মনে হচ্ছে না। আর—মিলিদির ওই চুল বাঁধাটা! রোগাটে গালের দু'পাশ দিয়ে দুটো রুক্ষচুলের বেণী ঝুলে এসেছে, আগায় কালো রিবনেরই ফাঁস। কতদিন যেন আগে মিলিদি যখন স্কুলে যেত তখন বোধ-হয় এইরকম দেখেছে সুব্রত। মাঝে মাঝে যখন মায়ের সঙ্গে মামার বাড়ি গিয়ে থাকতো, তখন শাদা ব্লাউজ আর কালো স্কার্ট পরা মিলিদি খাটো-

খাটো দুটো বেণী দুলিয়ে স্কুল বাসে গিয়ে উঠতো, দেখে কেমন হিংসে হিংসে লাগতো সুব্রতর।···সুব্রতর স্কুলটা একেবারে বাড়ির পাড়ায়। নেহাত ছেলেবেলায় বাড়ির কাজ করার লোক সঙ্গে করে দিয়ে আসতো, একটু বড় হতেই তার খবরদারি থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিল সুব্রত। রাস্তা পার হবার সময় বোঁচার মা যখন তার জলঘাঁটা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাজা হাজা হাতটা দিয়ে ক্যাঁক করে সুব্রতর একটা হাত চেপে ধরে কব্জা করে নিয়ে বলতো, 'ও কি হচ্ছে খোকা ? ইদিক উদিক করুনি বাবু।

এই দুর্দশাময় অবস্থা কতদিন সহ্য করা যায় ?

নিজে নিজে যেতে শিখে সুব্রত নিজেকে বেশ একখানা মাতব্বর ভাবতো, কিন্তু মিলিদির ওই দুই বেণী দুলিয়ে স্বর্গীয় গাড়িতে চড়ে বসা দেখলে মনটা খারাপ হয়ে যেত সুব্রতর।···কিন্তু তারপর কি আর মিলিদিকে সেভাবে চুল বাঁধতে দেখেছে সুব্রত ? মনে পড়ল না।

ক্লাশ নাইনে উঠলেই শাড়ি ধরতে হতো মিলিদিদের স্কুলে, তার সঙ্গে বোধহয় চুল বাঁধারও কিছু নিয়মকানুন ছিল। আর স্কুল ফাইন্যাল দিয়েই তো বিয়ে হয়ে গিয়েছিল মিলিদির। কত রকম সাজগোজ করতো, দেখে সুব্রতর বিরক্তি আসতো, হয়তো ওই সূত্রে মিলিদির সঙ্গে অনেকটা বিচ্ছিন্নতা এসে গেলো বলেই। সুব্রতর সামাজিক পোজিশান আর মিলি-দির সামাজিক পোজিশানে তখন আকাশ-পাতাল ফারাক।

অতঃপর কে কোথায়।

মিলিদি তো তার মিলিটারী ডাক্তার বরের সঙ্গে কোথায় না কোথায় থেকেছে তখন, কদাচ কখনো মায়ের কাছে চিঠি আসতো, হয়তো জম্মুর, হয়তো উধমপুরের, হয়তো চণ্ডীগড়ের হয়তো বা দেরাদুনের ছাপ মারা। তারপর তো নানা ঘটনা।

সুব্রতদের সামাজিক পটভূমিকায় 'মিলি' নামের মেয়েটা একটা বিতর্কিত বিষয়। সুব্রত ওতে উৎসাহী নয়। কী হলো মিলিদির তা কানেও নেয় নি। হঠাৎই এতদিন পরে একদিন কানে এল মিলিদি নার্সিং হোমে। মা যাচ্ছে ঘন ঘন, বৌদিও গেল দু'একদিন, দিদি নাকি বরের বাড়ি থেকে

এসে দেখে যায়।···তা' দেখলেই তো ভালো, রুগীর মন ভালো থাকে। কিন্তু সুব্রতরও যে এ-নাটকে ভূমিকা আছে জানা ছিল না সুব্রতর। মা হঠাৎ কদিন থেকে আক্রমণ করতে শুরু করেছে।

অতো ভালবাসতো তোকে মিলি, তুইও তো পায়ে পায়ে ঘুরতিস, তা সে বেচারী নানান জ্বালার ওপর রোগের জ্বালায় মরতে বসেছে একবার দেখতে যেতে ইচ্ছে হয় না।

তারপর মা ছেলেকে ছেড়ে এই যুগকে নিয়ে পড়েছিল। এমন নির্লজ্জ যুগও এলো! মানুষের কর্তব্য অকর্তব্যবোধ নেই, চক্ষুলজ্জার দায় নেই, স্নেহ-মমতা ছেদ্দা ভালোবাসার বালাই নেই, নেই হৃদয়ের কোনো বন্ধন। থাকবার মধ্যে আছে কী? না, শুধু প্রেমে পড়া আর ভাব করা! মা-বাপের মুখে চুনকালি দিয়ে অখদ্যে অপথ্যে একটা বিয়ে করা।

আরো কত কীই বলেছে না এই যুগকে। উঠতে বসতে বলে।

এই বাক্য যন্ত্রণার শ্রোতই সুব্রতকে এই মিসেস ব্যানার্জির নার্সিং হোমে ঠেলে নিয়ে এসেছে।···খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেই এসেছিল।

এখানে এসে মিলিদির খালি হাত রোগামুখ আর ছুটো বেণী যেন হঠাৎ সুব্রতকে অনেকটা পিছিয়ে নিয়ে এলো। আর কিনা সুব্রত 'মিলিদি কেমন আছো?' এই সাধারণ সহজ প্রশ্নটার বদলে বলে উঠল, এ কী মিলিদি, কীভাবে চুল বেঁধেছ?

সাধে আর মা যুগের ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে এতসব মন্তব্য করে? এই কি রুগীকে প্রশ্ন?

মিলিদি কিন্তু আকস্মিক এমন খাপছাড়া প্রশ্নে অবাক হলো না। শুধু একটু হেসে ইশারায় নার্সকে দেখাল।

অর্থাৎ কারুকার্যটা ওরই।

হাসির পর বললো মিলি, খুব ভালো লাগছে তোকে দেখে। কতদিন যে কোনো ভালো লোক আসে না!

একটা আলগা ঔদাসীন্য ঝরে পড়ল মিলির গলার সুরে।

একসময় মিলিদি খুব ভালো গান গাইতো না?

সুব্রত অবশ্য সে প্রশ্নের দিক দিয়ে গেল না। বললো, ভালো লোক ! ভালো লোক বলতে কী মীন করছো তুমি মিলিদি ?

এই যেমন তুই এলি !

আমি !

হো হো করে হেসে ওঠে সুব্রত।

আহা ! যদি একটা লিখিত সার্টিফিকেট দিতে মিলিদি।

মিলি হাসল, বলল, চাস তো ফরম তৈরী করে নিয়ে আনিস একটা ! যদি আমার সার্টিফিকেটের কোনো মূল্য থাকে।

নেই মানে ? সার্টিফিকেটের মূল্য হচ্ছে সার্টিফিকেট, ওর আবার শ্রেণী-ভেদ আছে না কি ? তোমার মনে আছে তুমি যদি কোনোদিন আমাদের বাড়িতে আসতে, আর আমাদের কাজকর্মের কর্ণধার মহিলাটি বলত, আহা, 'মিলি খুকুর মতন মেয়ে হয় না—' তখন তোমার মুখ আহ্লাদে লাল হয়ে উঠত না ?

বাবা, খুব মনে আছে তো তোর ? কী যেন নাম ছিল তার ?

বোঁচার মা।

হ্যাঁ হ্যাঁ ! কী কাজেরই ছিল। আছে এখনো ?

ছিল এযাবৎকাল, এই কিছুদিন হলো মরে বেঁচেছে।

মরে বেঁচেছে কেন ?

আরো বাঁচলে তো আরো খাটতে হতো।

মিলির ফাকাসে ফর্সা মুখে একটু রহস্যময় হাসি ছড়িয়ে পড়ল। বলল, তাহলে বলছিস বেঁচে যাওয়ার একটা প্রধান উপায় মরে যাওয়া ?

সুব্রত নড়ে চড়ে বসলো।

তাকিয়ে দেখলো নিরলঙ্কার মিলিদির দুবেণী ঘেরা মুখটা যেন সেই স্কুলের ছাত্রী মিলিদির মতো দেখতে লাগছে। ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ আর ভারী সরল।

সুব্রত বলল, সবক্ষেত্রে তা' বলে নয়।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্যই তাই। তাই না ?

সুব্রত বললো, হতে পারে।
বলেই বললো, এখানে 'ধূমপান নিষিদ্ধ' নয়তো?
মিলি একটু থতমত খেয়ে বললো, ধূমপান? কই কাউকে তো—মানে কেউ তো, কিন্তু না, না। ডাক্তাররা তো খায়।
ঠিক আছে। এখন আমার নামের আগে 'ডক্টর' বসানো যায়—
বলে সুব্রত একটা সিগারেট বার করল।
মিলি খুশীর গলায় বললো তোর ডক্টরেট করা হয়ে গেছে?
ওই আর কি?
শুনে খুব ভালো লাগলোরে! মিলিদি হালকা হাসির ছোঁওয়া-লাগা গলায় বলল, একসময় আমারও যা দারুণ উৎসাহ ছিল। ভাবলে হাসি পায়।
হাসি পায়?
সুব্রত সিগারেটটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে বললো,হাসি পাবার কী আছে?
পায় তো!
বোকামি! অনেকটা তো করে ফেলেছিলে। এখন ইচ্ছে করলে তুমি এই বিছানায় থেকেও আরও খানিকটা এগিয়ে যেতে পারো। আমাদের মতো তো ল্যাবরেটরীর কাজ নয়। শুধু বইয়ের পাহাড়ের মধ্যে বসে—
মিলিদি বললো, দূর আর হয় না।
না হবার কী আছে?
সুব্রত মুখ ফিরিয়ে ধোঁয়াটা উড়িয়ে দিল।
মিলিদি বলল, আধাখাপ্‌চা জিনিস নিয়ে আবার শুরু? সে এনার্জি নেই! বাঁ-হাত দিয়ে কপালের পাশের ঝুরো চুলগুলো আস্তে সরিয়ে দিল, আবার বলল, জীবনটাই আধাখাপ্‌চা। এজন্মে এই রকমই গেল আর কি!
সত্যি! মিলিদি, তোমরা মেয়েরাই পারো এরকম কথা বলতে।···সুব্রত একটু কড়া গলায় বললো, ঠিক মনে হলো দিদিমার ভাষণ শুনলাম।
জীবনই বয়েসকে লোপাট করে ফেলেরে সুবু, মিলিদি আবার পাখার বাতাসে ওড়া কুচো চুলকটা ঠেলে কানের পাশে পাঠিয়ে দিয়ে বললো, আমার তো মনে হয় যেন কত—কত বছর পার হয়ে এলাম।

অসুখের সময় অমন অনেক বাজে ভাবনা মাথায় আসে বুঝলে ?···সুব্রত উঠে গিয়ে সিগারেটের শেষাংশটুকু নিয়ে জানলার বাইরে ফেলে দিয়ে এসে বললো, ঘুমের ওষুধ-টষুধ দেয় তো ? তারই রি-অ্যাকশান। ওটা ছাড়ো। কী যেন সাবজেক্ট ছিল তোমার ?

মনে নেই।

ছেলেবেলার মতো রাগ দেখাবো মিলিদি, সুব্রত বললো, মনে আছে রাগ হলে আমি তোমায় কী বলে শাসাতাম ?

খুব মনে আছে। মিলি একটু হেসে উঠল, বলতিস, ভীষণ রেগে গেছি আমি কিন্তু 'তুই' বলব বলে দিচ্ছি। রাগটা প্রধানতঃ চুল আঁচড়ে দিতে চেষ্টা করলেই 'ভীষণ' বেড়ে যেত।

যাক মনে আছে দেখছি।

ছেলেবেলার কথা কেউ ভুলে যায় না রে। জীবনের শ্রেষ্ঠকাল।

সুব্রত একদম ভুলে গেছে যে সে ঘণ্টা বাজার আগে পালাবে ঠিক করে-ছিল। জগদীশের কবলে পড়বে না বলে। সুব্রত কথার পিঠে কথা চালিয়ে যাচ্ছে।

শ্রেষ্ঠকাল ! রাবিশ ! আমার তো মনে হয় সব থেকে ওয়ার্স্ট কাল। পরাধী-নতার চূড়ান্ত।

মিলিদি উদাস গলায় বলল, মেয়েরা তো চির পরাধীন।

আঃ আবার সেই পিতামহীর ভাষা ? রাগ না দেখিয়ে পারা যাচ্ছে না। এই সব উইমেনস লিব-এর যুগে এরকম কথা বলতে তোর লজ্জা করা উচিত মিলিদি !

মিলি একটু হেসে ফেলল।

নাঃ সত্যিই রেগেছিস দেখছি।···আমার থিসিসটা ছিল 'বৌদ্ধযুগের সাধারণ নারী।'

হ্যাঁ মনে পড়ছে। একদিন বোধহয় তর্ক তুলেছিলাম বিষয় নির্বাচনটা বাজে হয়েছে। সে যুগের সাধারণ নারীদের হদিস তুমি পাবে কোথায় ? কেউ কি লিখে রেখে গেছে ? তুমি বললে, কেউ ঠিকঠাক লিখে রেখে গেলে

আর রিসার্চের বাহাদুরী কি ?

বাবাঃ তোরও তো কম মনে থাকে না !

মিলিদি আবার চুল সরালো। মুদ্রাদোষই মনে হচ্ছে। কিন্তু এতবারের পর সুব্রতর চোখে পড়ল—মিলিদির দুটো হাতই পুরো খালি নয়, বাঁ হাতে একটা সরু 'লোহা' জাতীয় কী যেন রয়েছে।

তার মানে এখনো সংস্কারমুক্ত হতে পারে নি।

কিন্তু এই 'বন্ধন'-টা আসে কোথা থেকে ?

সুব্রত হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলাল। বললো, ঘরটা মন্দ নয়, জানলা দিয়ে হাওয়া-টাওয়া আসে।

মিলি বললো, তা হবে। এই নট নড়ন-চড়ন হয়ে পড়ে থেকে থেকে হাওয়া-টাওয়ার অনুভূতি ভুলে গেছি।

সুব্রত একটু বিষণ্ণ হলো।

সত্যি বেচারী !

বলল, কতদিন যেন আছো এখানে ?

মাস আড়াই হতে চলল।

'কী এমন অসুখরে বাবা—' বলতে গিয়েও থেমে গেল সুব্রত। নিশ্চয় কোনো 'মহিলা জনোচিত' ব্যাপার। জিগ্যেস করা মানেই অসুবিধেয় পড়া, আর অসুবিধেয় ফেলা।···কিন্তু মিলিদির কি কোনো বাচ্চা-টাচ্চা হয়েছিল কখনো ? কই ? 'জীবিত' থাকলে তো দেখাই যেত : মৃত হলে শোনাও যেত। মায়ের তো ভাইঝি সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা, 'আহা আহা' আবেগ আক্ষেপ।

যাক, তাড়াতাড়ি যাহোক একটা উত্তর দিয়ে দিলো, আড়াই মাস ! ও বাবা !

কিন্তু মুখে না বললেও প্রশ্নটা বোধহয় সুব্রতর মুখের রেখায় ফুটে উঠেছিল, তাই মিলিদি একটু হেসে বলল, যা ভাবছিস তা' নয়। 'ব্যাপার গুরুচরণ' ! (ছেলেবেলার এই ভাষাটা ব্যবহার করলো মিলি।) মেরুদণ্ডে ঘুন ! অপ-রেশনের ছুরি খুঁচিয়ে ঘুনপোকাদের বার করে ফেলে দিয়ে আস্ত একটা

দেহকে লোহার খাঁচায় ভরে রেখে ফেলে রেখেছে।

সুব্রত লজ্জিত হবার ছেলে নয়। তবু লজ্জিত না হয়ে পারল না। ইস! নিশ্চয় এতদিনে এটা অন্তত তার জানা উচিত ছিল। মা দাদা বৌদি কত সময়ই তো কত কী আলোচনা করে, তার মধ্যে 'মিলি মিলি' শোনে বটে, তবে কী বাবদ তা' কান দেয় নি।

আর একটা অদ্ভুত, ভেবে অবাক হলো সুব্রত আজ এই নার্সিং হোমের ঘরে জানলা দিয়ে এসে পড়া পড়ন্তবেলার আলোয় মিলিদির শীর্ণ ন্যাকাসে উদাসীন উদাসীন মুখটা দেখে মিলিদির ওপর যেমন মমতা হচ্ছে, তেমন মমতা তো কোনোদিন অনুভব করে নি সে! নইলে তাকে মায়ামমতা করবার মতো কারণ যে আসে নি তা তো নয়।

এখনো আকাশের আলো শেষ হয়ে যায় নি, সাপ্লাই কমে এসেছে এই মাত্র, বন্ধ হয় নি তবু হঠাৎ ফট করে আলো জ্বলে উঠল ঘরে। আর ঘণ্টা-ধ্বনি শোনা গেল। ওয়ার্ণিং বেল! তার মানে আলোটাও বিদায়ের সঙ্কেত।

মিলিদি বলে উঠল যাঃ! হয়ে গেল।

তারপর আবার বলল এত দেরী করে এলি তুই।···আর একদিন আসিস না রে!

ভারী মিনতি মিনতি গলা।

সুব্রত আবার লজ্জিত হলো, আর সেটা ঢাকতে বলে উঠল, মাত্র এক-দিনই? দু পাঁচ দিন হলে আপত্তি?

আপত্তি!

মিলি হঠাৎ মুখটা দেওয়ালের দিকে ফেরাল। তারপর আস্তে বলল, তুই এলি এত ভালো লাগলো! যে আসে বুঝলি, যেন করুণায় মরে যাচ্ছে। তাকাবে ছলছলে চোখে, কথা বলবে মাখন বুলিয়ে আর অসুখের বিবরণ শুনতে চাওয়া ছাড়া কথা নেই। তোর সঙ্গে একটু অন্য কথা বলে মনে হচ্ছিল বোধহয় এখনো একটা মানুষ আছি।

আবার ঘণ্টা বেজে উঠলো।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল সুব্রত। আর এখন এই সময় মিলিদি বলে উঠলো

এই সুবু, এলি আমার কাছে, কিছু খাওয়ালাম না। ওই মীট্‌সেফটা খোল না ভাই লক্ষ্মীটি! আঙুর আছে অনেকগুলো, নে চারটি!

চমৎকার!

সুব্রত বলে উঠলো, আমি তোমায় নার্সিং হোমে দেখতে এলাম খালি হাতে আর কিনা তুমি আমায়—

মিলিদি বলল, খালি হাতে এলি বলেই তো চোখ জুড়িয়ে গেল। ফলের ঠোঙা হাতে নিয়ে ঢুকলে বড় বেমানান বিচ্ছিরী লাগতো তোকে। নে না ভাই চটপট। ঈস এতক্ষণে মনে পড়ল আমার।

ঠিক আছে ঠিক আছে নিচ্ছি—

বলে মীট্‌সেফটার দরজা খুলে ফেলে সামনেই প্লেটে পড়ে থাকা কয়েক থোকা আঙুর থেকে একথোকা তুলে নিল সুব্রত। টপাটপ্‌ মুখেও পুরে ফেলল গোটাকতক।

বেশ মিষ্টি নারে?

হুঁ! খুব।

আর এতক্ষণ পরে সুব্রত আরও কটা আঙুর মুখে ফেলে যেন নেহাতই কথার কথা এইভাবে বলে উঠলো ফাইন। এ আঙুর নিয়ে এসেছে কে? তোমার বর বুঝি?

আমার বর! আঙুর এনেছে আমার বর! হি হি হি সুবু, কী বললি?

হঠাৎ ভারী বেমক্কা ভাবে হেসে ওঠে মিলিদি। আর তারপরেই যন্ত্রণায় মুখটা একটু কুঁচকে কাঁধটায় আঙুলের ডগা বাড়িয়ে চেপে ধরে, বাবাঃ একটু হাসবারও জো নেই! অথচ—তুই এমন হাসির কথা বললি—

সুব্রত যে একেবারে খেয়াল করে নি এটা হাসির কথা তা' নয়, তবু মিলিদির বিধ্বস্ত দাম্পত্য জীবনের ছবিটাকে কোন্‌ অ্যাঙ্গেল থেকে নেওয়া যায়! তাই হঠাৎ আঙুর প্রসঙ্গ। তা হারবে না তো তাই তেমনি অবোধের ভূমিকা নিয়ে বলে ওঠে, এতে এত হাসির কী হলো?

হলো না? তুই আমার জীবনের খবর রাখিস না?

সুব্রত তেলাগোলা মুখ করে বলে, তা জানব না কেন? ডিভোর্স হয়ে

গেছে তো। কিন্তু তাতে কি? একসময় তো এত চেনা ছিল? অসুখে দেখতে আসতে পারে না? ওদেশে তো ডিভোর্সের পরও বার্থডের প্রেজেন-টেশান পাঠায়, খ্রীষ্টমাসে ফুল নিয়ে দেখা করতে আসে--

থাম বাবা, তুই আর ওদেশ দেখাতে আসিস নি। ওদেশের দৃষ্টিভঙ্গী আর আমাদের—

বাঃ! ডিভোর্সটা তো বলতে হয় ওদেশেরই অবদান। তবে? লোকটা একসময় তো তোমার বর ছিল—

সুব্রত কি মজা দেখতে চাইছে? না কি মিলিদির হৃদয় কন্দরটা পর্যবেক্ষণ করতে টর্চ ফেলে দেখছে? হয়তো শেষেরটাই, নইলে মজা দেখবে, এত হৃদয়হীন হবে?

মিলিদি আবার তেমনি বেমক্কা একটা হাসি হেসে বলল, এখন বর্বর হয়ে গেছে। আরো একবার বিয়ের পিঁড়িতে বসেছে যখন। দুবার 'বর'।

অ্যাঁ?

এখবরটা তো কই শুনেছে বলে মনে পড়ছে না সুব্রতর।

তাই, না চমকে পারে না। আর একটা বিয়ে করেছে সমীরণবাবু?

বাঃ, করবে না? মনের মতো বৌ একটা দরকার নয়? যে বৌ পার্টিতে গিয়ে নাচতে পারবে, গাইতে পারবে, ড্রিঙ্ক করে বেহুঁশ হয়ে ড্রাইভারের কোলে চেপে বাড়ি ফিরতে পারবে, সকলের সামনে বরের গলা ধরে—বিয়ে করেছে একটা পাঞ্জাবী মেয়েকে।

নিঃশব্দে নার্স এসে ঘরে ঢুকলো। মুখে পাথুরে ভাব।

শেষ ঘণ্টাধ্বনির পরও টাইম ওভার হয়ে গেছে।

ওর এই আবির্ভাবটাই যেন নীরব গলাধাক্কা।

গেট্ থেকে বেরিয়েই তাড়াতাড়ি পা চালাচ্ছিল সুব্রত বাস ধরতে তো বটেই জগদীশের হাত এড়াতেও। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না।

বাসের জন্যে অপেক্ষার ক্ষণে জগদীশ এসে ধরল, আছিস? থ্যাঙ্ক গড্। চল অনেকদিন পরে একসঙ্গে—

সুব্রত ভুল চাল দিতে গিয়েও সামলে নিল।

যদি বলে, আমি এখন বাড়ির দিকে যাচ্ছি না, জগদীশ নির্ঘাৎ বলবে তুই যেদিকে যাচ্ছিস সেই দিকেই যাবো আমি।

বলতেই পারে, কারণ মাত্র এখন সওয়া ছটা। গরমের বিকেল।

অতএব উঠতে হলো গোল পার্কের বাসে।

জগদীশের বাড়ি ঢাকুরিয়া, কাজেই শেষ অবধি বন্ধন।

বন্ধন যখন এড়ানো যায় না, তখন তাকে মেনে নিতে হয়। সেটাই বুদ্ধির কাজ। অতএব অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর একটা মিনিবাস পেতেই উঠে পড়ে গুছিয়ে বসে বলে ওঠে সুব্রত, যাক, এখন শুনি পুত্র না কন্যা।

বাসেট্রামে জগদীশের সঙ্গে কথা বলা মুশকিল, অন্যের কান ফাটিয়ে নিজের নিভৃত অভিজ্ঞতার বিবরণ বলতে বসবে। তাই ওর দাম্পত্য জীবনের অভিজ্ঞতার কথা আর তোলে না। যদিও বৌভাতের নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরে আসার সময় বন্ধুরা বলেছিল, আচ্ছা আজ তো আর জানবার কিছু নেই, পরে একদিন আসা যাবে তোর নতুন এক্সপিরিয়েন্সের খবর নিতে।

বিয়ের দুদিনের মাথায় তবু তখনই জগদীশ ছ্যাবলা হাসি হাসতে শিখে গিয়েছিল, বলেছিল, পরশুই তো হানিমুনে যাচ্ছি বরং দিন দশেক পরে আসিস।

তারপরে এই।

জগদীশ বলল, আর বলিস কেন, কন্যা।

তাতে কি?

আরে আমিও তো তাই বলছি, তাতে কি? কিন্তু গিন্নীর মন খারাপ। বলে, 'এযুগে ছেলে আর মেয়ে দুই সমান?' ছাড়ো ও কথা। আকাশ পাতাল তফাত। মেয়েরা যতই লেখাপড়া শিখুক, আর চাকরিটাকরি করুক, অবস্থা একই।

মহিলাটি তো দেখছি বেশ অপ্রগতিশীল।

ওই তো। বলে কি, ছেলে বড় হলে আনন্দ, মেয়ে বড় হলে আতঙ্ক। ওর দিদিদের দেখছে বুঝি—বড়দির মেয়েটা বড় হয়ে গেছে বলে বড়দি বাপের

বাড়ি আসতে পায় না। নিয়ে এলে পড়ার ক্ষতি, রেখে এলে আরও ক্ষতির ভয়। অথচ মেজদির ছেলে একটু বড় হতেই খুব নাকি পা বেরিয়েছে তার। আচ্ছা ছ্যাখ তিনদিনের বাচ্চাটাকে নিয়ে এখন বড় হওয়ার চিন্তা। মাথাটা আরো বিগড়েছে ঠিক পাশের ঘরেই এক পেশেণ্ট দেখে। মহিলাটি না কি খুবই সুন্দরী, বিয়েও হয়েছিল দামী স্বামীর সঙ্গে, কিন্তু টেঁকে নি। ডিভোর্স হয়ে গেছে। মিলিটারী ডাক্তার বর, মেজাজও না কি মিলিটারী —তা' শীলার মতে 'এই তো জীবন মেয়েদের'—

সুব্রত হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলে, ইস্ একটা যে ভারী ভুল হয়ে গেছে। নার্সিং হোমের খবরটা ছোটমাসীকে দিয়ে যেতে হবে, নামছি এখানে।

নেমে গেল সুব্রত।

আশ্চর্য! মেয়েরা কেন গোয়েন্দা হয় না।

হাতে পায়ে খড়িওঠা, তেলের বালাইহীন ধুলো ধুসকুণ্ডি মাথা, পরনে ময়লা একটু গামছার টুকরো, পাঁজরের হাড় ক'খানা (হাড় না বলে কাঁটা বললেই ঠিক বলা হয়) চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। গায়ের রংটা একটু পরিষ্কার হলে বোধহয় পেটের শিরাগুলো গোণা যেত, বড্ড ময়লা বলেই বোঝা যাচ্ছে না। তাছাড়া আপাতত তার পেট বুক কিছুই দেখা যাচ্ছে না। ডুমুরের পাতায় চাপা পড়ে গেছে বেওয়ারিশ পঞ্চু একটা পানা ঢাকা পচা পুকুরের পাড় ঘেঁষে একগাদা থোকা থোকা ডুমুর ভর্তি মস্ত মস্ত দুটো ডুমুরের ডাল, আস্ত গাছ বললেই চলে মাটিতে ঘষটে টেনে টেনে নিয়ে আসছিল।

অবস্থাটা বিপজ্জনক, ওই ডালের ভারে একটু যদি বেকায়দায় টাল খায়, নির্ঘাৎ লাট খেয়ে ওই পচা পুকুরের মধ্যে গিয়ে পড়বে। ডুমুরের ডাল দুটো ছেলেটার মাথা ছাড়ানো ফলপাতা সমেত ওজনে ওর থেকে ভারী বৈ কম নয়। কাজেই যতটা সম্ভব সাপটে ধরে রাখতে চেষ্টা করতে করতে আসে।

অতএব ওই 'ডুমুরপাতা'র ব্যাপারটা লজ্জা নিবারণার্থে নয়। নেহাত-ই

অবস্থার গতিকে। বেমক্কা ডালপালার হঠাৎ হঠাৎ খোঁচা ডুমুরপাতার গাছড়ে দেওয়া কর্কশ স্পর্শ আর দুপুর রোদের আগুন আগুন ঝোড়ো হাওয়া ছেলেটাকে রীতিমতো বিপর্যস্ত করে তুলছে।

অথচ পুকুরটার একেবারে গা ঘেঁসে আসা ভিন্ন উপায় নেই। পুকুর পাড়ের এই সঙ্কীর্ণ পায়ে চলে চলে তৈরী হয়ে ওঠা পথটুকুর ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে, বিচ্ছিরি রকমের কাঁটা গাছের ঝোপ।

আগাছার বৃদ্ধি বেশী, অনবরত বেড়ে বেড়ে আর শুঁড় বাড়িয়ে বাড়িয়ে এই সঙ্কীর্ণ পথটুকুও গ্রাস করার চেষ্টা চালিয়ে আসছে ওই কাঁটা গাছেরা। লোকগুলো আছে, এবং এই পথ দিয়েই চলাচল করে, তারা যদি যেতে আসতে গাছেদের ওই আগ্রাসী ইচ্ছেটাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে থাকে তাহলে অবস্থা অবশ্যই আয়ত্তের বাইরে চলে যায় না। কিন্তু সেটুকুই বা করছে কে? কার এত গরজ? কাঁটা ঝোপকে গাল দিতে দিতে পাশ কাটিয়ে পুকুরের কাণাঘেঁষে কোনো মতে পার হবে, চুকে-গেল। পথ চলতে বাধাটা বিরক্তিকর নিশ্চয় তাই বলে সেই বাধা দূর করতে আঙুল নাড়বে? কেন? কে? এই জলটুভি গ্রামে কি আর কারো আঙুল নেই? যার গরজ থাকে, সে নাড়ুক।

এই জলটুভি গ্রামে একটা বোকা আছে বটে সে হচ্ছে বেওয়ারিশ পঞ্চু। কিন্তু তার আর ক্ষমতা কত? তার হাতিয়ার কোথায়? মাঝে মাঝে একে ওকে বলে মরে 'অ্যাকখান দা কাটারি দ্যাওনা গো। পুকুরধারের রাস্তাটা একটুকু সাফ্ করে ফেলি। হাঁটতে চলতে কাঁটা ফোটে।'···কিন্তু কে আবার তার কথায় কান দিচ্ছে?

হাতিয়ারের অভাবেই না পঞ্চুকে চারটি ডুমুরের প্রয়োজনে গাছটার অঙ্গ থেকে বড় বড় দুটো অংশ খসিয়ে আনতে হয়েছে। গাছে উঠে তার ডালের গোড়ায় লম্বা খানিকটা দড়ি বেঁধে রেখে এসে নীচে থেকে প্রাণ-পণে টানতে টানতে মড়াৎ করে ডালটা ভেঙে পড়ে গেছে। এ-বুদ্ধিটা পঞ্চুর নিজস্ব।

এখন ভরদুপুর, রাস্তায় কোথাও কোনোখানে লোকের চিহ্ন নেই তাই

পঞ্চুর এই বীরত্ব কারো চোখে পড়ে নি, পড়লে দুটো চড় চাপড় খেতে হতো নির্ঘাৎ। যদিও পোড়ো শীতলা মন্দিরের পিছনের জঙ্গলের ওই জঙ্গুলে ডুমুর গাছগুলো বেওয়ারিশই, কিন্তু পঞ্চুও তো বেওয়ারিশ।

কাঁটাবনের এলাকা ছাড়াতেই পঞ্চু থমকে দাঁড়াল পুকুরের ওপাড়ের মাঠ ধরে দুজন বাবু আসছে যেন। গালে ডুমুরপাতার ঘসটানি, তবু নিরীক্ষণ করে দেখতে চেষ্টা করল, ও! একটা তো দাদাবাবু। তাহলে দাদাবাবু ফিরে এলো আবার। আর দিদি বলতেছে কি না, আর আসবেনি। তুই দেকিস পঞ্চু। কক্ষণো আসবে নি। তা' এই পাঁচদিন পরে এলি যদি বা কারে আবার সঙ্গে জুইটে আনলি! অ্যাঁ! এই ভরদুপুর বেলা কে ওর ভাতজল করবে শুনি? দিদির বড্ডো ক্ষ্যামতা দেকেচিস তুই!

বিরক্ত হলেই পঞ্চু মনে মনে সবাইকে 'তুই' সম্বোধনে যা খুশী শোনাতে থাকে। এটা পঞ্চুর আশৈশবের অভ্যাস।···যাক দিদিকে খবরটা আগে ভাগে দিতে পারলে ভালো হয়। পঞ্চু একটু মোড় ঘুরে, তেমনি ভাবেই ডুমুরডালটাকে টানতে টানতে একখানা নির্লজ্জ দৈন্যের সামনে এসে দাঁড়াল।

'নির্লজ্জ' ভিন্ন এ দৈন্যের আর কোনো নাম দেওয়া যায় না। এমন নয় মেটে বাড়ি খড়ের চাল, কচুর ডালের বেড়া ঘেরা, এমন বাড়ির অভাব আছে এখানে। বরং বলা যায় এইটাই স্বাভাবিক। জলটুভি গ্রামে তো পাকা দালানই নেই। সবই খড় আর মাটির ঐতিহ্য বহন করছে। কিন্তু তাদের মধ্যেও তো সৌষ্ঠব রয়েছে। পথ চলতে চলতেও দেখতে পাওয়া যায় মেটে উঠোনটি গোবরমাটি দিয়ে পরিষ্কার করে নিকোনো, মেটে দাওয়াটুকুতে পড়লে সিঁদুর ওঠে।

বেড়ার গায়ে বুনো ফুলের লতা, দাওয়ার ধারে তুলসীমঞ্চ, দরজার মাথার চৌকাঠে হলুদ আর সিঁদুরের ফোঁটা। ভূতচতুর্দশীর সন্ধ্যায় দরজায় দরজায় সিঁদুর-হলুদের ফোঁটা দিয়ে রাখলে রাত্রে ভূত আসে না, এটা এদের প্রায় সকলেরই জানা। কিন্তু পঞ্চু যেখানে এসে ঢুকল সেখানে যে কারুর এটা জানা নেই, তা চৌকাঠ দেখলেই বোঝা যাচ্ছে।···এখানের কেউ যে মেটে

দাওয়া, মেটে উঠোন নিকোতে হয় বলে জানে এমন মনে হচ্ছে না।··· এখানে তুলসীগাছ নেই, নেই এককোণে মাচা বেঁধে লাউ-কুমড়োর লতা তোলা! ডালপালা লতাপাতা ছাওয়া বেড়াটায় নেই বুনো ফুলের লতার বেষ্টন। শ্রীহীন হত দরিদ্র চেহারার এই বাড়িখানা যেন মালিকের অবহেলা আর ঔদাসীন্যের পরাকাষ্ঠার পরিচয় বহন করে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু দাঁড়িয়েই কি থাকবে আর বেশীদিন? মাটির ঘর তুচ্ছ বলেই বোধহয় তার অভিমান বেশী, যত্নের অভাব সইতে পারে না, ধরাশয্যা নেয়।

পঞ্চুর মতোই অযত্নের ছাপ মাখানো এই মাটির বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালো পঞ্চু।···আবোল তাবোল জিনিস দিয়ে আটকে রাখা উঠোন ঘেরা বেড়ার দেওয়ালটার কোনোখানে একটা প্রবেশ পথ আছে, আপাতত যেটা বন্ধ রয়েছে বলেই বোঝা যাচ্ছে না, সেই পথটা কোথায়। কিন্তু পঞ্চু জানে। পঞ্চু তাকে খোলবার কৌশলও জানে।

ডুমুর ডালদুটো নামিয়ে রেখে পঞ্চু বেড়ার কোনো একটা ফাঁকের মধ্যে হাত গলিয়ে ভিতরে আটকানো একটুকরো আড়বাঁশ কৌশলে ঠেলে সরিয়ে ফেলে দরজাটা খুলল পঞ্চু; অতঃপর সেই মুক্তদ্বারের মধ্যে দিয়ে এতক্ষণের বয়ে আনা জিনিস দুটোকে টেনে ভিতরের উঠোনে নিয়ে গিয়ে ফেলে, ডাক দিলো দিদি! দিদিগো!

গৌতমের ধারণা ছিল না শহর কলকাতার এত কাছে, মাত্র মাইল কয়েক দূরে এমন একটা জায়গা থাকতে পারে, যেখানে সহসা এসে পড়লে মনে হয় কেউ যেন আদ্যিকালের পৃথিবীর একটু টুকরোকে এখানে ঘটস্থাপনা করে রেখে দিয়েছে।

আর মাত্র ঘণ্টাকয়েক আগেও ধারণা ছিল না তার 'গৌতম' নামের হতভাগাকে হঠাৎ ছুটির ভোরের সুখের বিছানা ছেড়ে উঠে এসে সেখানে এসে দাঁড়াতে হবে।

অসতর্ক একটু স্বগতোক্তির মাধ্যমে বিস্ময়টা ব্যক্ত করল গৌতম, কানে যেতেই চিত্ততোষ বলে উঠলো, জানার পরিধি মানুষের কতটুকু সেটাই কি

জানিস ? দু'সেকেণ্ড পরেই হয়তো তোকে অথবা আমাকে, অথবা পৃথিবীর যে কাউকে পৃথিবী থেকে চলে যেতে হতে পারে এই মুহূর্তে সেটা জানা নেই।

গৌতম আর স্বগতোক্তির দিকে যায় নি।

মুড ভালো থাকলে হয়তো বন্ধুকে প্রশ্ন করে উঠতে পারতো, 'আর কত-দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী ?'

কিন্তু তেমন মুড নেই এখন।

রোদ চড়ে উঠেছে, রাস্তাহীন পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে জুতোজোড়াটা শুধু ধুলোয় গড়া বলেই মনে হচ্ছে, আর তেষ্টায় গলার মধ্যে সেই ধুলোর স্বাদ।

বর্ষার দিনের হাঁটু বসে যাওয়া থকথকে কাদার মাঠে গরুরগাড়ির চাকার খাঁজগুলো এখন নরম ধুলোর পুরু কার্পেট। পা ফেলতেই পা বসে যাচ্ছে। আর হাওয়ার মাস বলেই সেই গুঁড়ো হয়ে যাওয়া ধুলোর রাশি দস্তুর-মতো একটা একটা মজার খেলা খেলে চলেছে। মাটি থেকে ধাক্কা খেয়ে উঠছে, বাতাসে পাক খাচ্ছে, আবার খানিকদূরে আছাড় খাচ্ছে। আর পাক খেতে খেতে পথচারীর চোখে মুখে খানিকটা আঁচল বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

গৌতম ভাবল, এইটুকুতেই কাতর হচ্ছি ! ছি ! মরুভূমিতে যখন বালির ঝড় ওঠে ? আর কেউ পথ হারায় ?

গৌতমের বাবা, ছেলেদের ছেলেবেলায় শিক্ষা দিতেন, যদি কোনো ব্যাপারে তোমার খুব কষ্ট হয়, তুমি মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করবে, কত লোকের হয়তো এর থেকেও বেশী কষ্ট হচ্ছে। ছুরিতে আঙুল কেটে ফেলে কাঁদ-ছিস ? ধ্যেৎ ! যুদ্ধে গিয়ে সৈন্যদের তো হাত পা-ই উড়ে যায়।

গৌতমের এখনকার এই ভাবনাটা হয়তো সেই শৈশবের শিক্ষার ফল। শৈশবের পর আর বাবা ছেলেদের কোনো শিক্ষা উপদেশ দিতে চেষ্টা করেন নি। কেন করেন নি কে জানে ? কিন্তু একদার সেই শিক্ষাটা তো আপাতত কাজে লাগল। সকাল থেকে যে একটা খুব বিশ্রী লাগাটা

মনের মধ্যে পাথরের চাঁইয়ের মতো বসে রয়েছিল, সেটা যেন আস্তে আস্তে ওই উড়ন্ত ধুলোগুলোর মতো ধূসর হয়ে উড়ে যাচ্ছে। চারিদিক তাকিয়ে দেখতে দেখতে ভেবে অবাক হচ্ছে এখানে থাকতে পারে? যার জন্য চিত্ততোষ গৌতমকে এভাবে টেনে নিয়ে এলো।

কম বিশ্রী তো লাগছিল না।

যতক্ষণ এসেছে, মনে মনে নিজেকে একশোবার বুদ্ধু বলেছে, গাধা বলেছে, হতভাগা গাড়োল, বাঁদর নায়ের বাঁদর ইত্যাদি করে অনেক কিছুই বলেছে। অথচ সেই সব বিশেষণের উপযুক্ত ভাবেই বিনা বিদ্রোহে চিত্তর অনুসরণ করেছে।

ভোর ছটার ট্রেনটা ধরতে পারলে নাকি 'রাজারহালে' আসা যেত। অন্তত চিত্ততোষের এই অভিমত। কিন্তু কী আর করা। যেটা হয় নি তার জন্যে ধিক্কারবাণী হজম করা ছাড়া আর কীই বা করা যায়। অতএব সেটা হজম করতে করতেই আসা। বাস বদল করে দু দুটো লম্বা পাড়ি দিয়েও, জীবনে যে গ্রামের নাম শোনে নি গৌতম সেই 'জলটুভি' গ্রামে এসে পৌঁছতে দুপুর গড়িয়ে যেতে বসেছে।

প্রাইভেট বাস, ড্রাইভারের মর্জির উপর ভাগ্য। মাঝখানে কোথায় যেন একবার ড্রাইভার সাহেব হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ে একটা আঁকা-বাঁকা পথ ধরে কোথায় যে ঢুকে পড়ল, আসেই না, আসেই না।

প্রতীক্ষা অসহ্য হয়ে ওঠায় প্যাসেঞ্জাররা নেমে পড়েছিল, গৌতমও অগত্যা। চোখে পড়ল ঈষৎ দূরে একটা হতভাগা চেহারা চায়ের দোকানের সামনে গিয়ে ভীড় করেছে সবাই।

চায়ের দোকান।

হোক হতভাগা চেহারার দোকান, জঘন্য চা, তবু চা তো। এই দীর্ঘ প্রতীক্ষাও খানিকটা সহনীয় হয়ে যাবে।

অতএব—

হাফ সার্ট খাটো ধুতি, চেক লুঙ্গি, পিঠ ঝাঁজরা গেঞ্জি, ঢোলা পা টিকিনের পায়জামা আর ছিটের হাওয়াই শার্ট পরা সহযাত্রীদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে সেই

নিমের নির্যাসই খানিকটা গলায় ঢেলে নিয়েছে গৌতম নামের চা সম্পর্কে অতি খুঁতখুঁতে ছেলেটা।

রুবি রেগে রেগে বলে, তোর মনের মতো চা বানানো আমার দ্বারা হবে না দাদা। দেখব এরপর বৌ এসে যখন নিমপাতার আরক বানিয়ে সামনে ধরে দেবে। চুমুক দিয়ে বলবি, 'আঃ! এমন নইলে চা।'

গৌতম বলে, তা পৃথিবীর যা নিয়ম তাই করবো, এটা আর আশ্চর্য কী? এখন ওই চা-টা গলায় ঢেলে ভেবেছিল 'নিমপাতার আরক' শব্দটা চা সম্পর্কে ব্যবহার করা চলে দেখা যাচ্ছে।

অভাবে স্বভাব নষ্ট।

আশ্চর্য কত তাড়াতাড়িই হয় সেই নষ্টটা।

নেহাত আভিজাত্যটুকুর রেশ বজায় রাখতে ফাটাচটা মোটা কাঁচের কাপ-ডিশটা 'একটু ভালো করে ধুয়ে দেবার' নির্দেশ দিয়েছিল, আর সাতবাসি নেড়ো বিস্কুট দেখে নাক কুঁচকে প্রত্যাখ্যান করেছে। আর কী করা যায়?

চিত্ত অবশ্য অম্লান মুখেই কাপডিশ না ধুইয়েই খেল এবং সাতবাসি বিস্কুটও খেল। এবং তার থেকেও অম্লান মুখে দুজনের দামটাই গৌতমকে দিয়ে দিতে বলল।

অনেকক্ষণ পরে ড্রাইভার এলো।

কোনো কৈফিয়তের ধার ধারল না, মদগর্ব চালে নিজের আসনে গিয়ে স্টিয়ারিং ধরে বসল। কেউ কেউ রসসৃষ্টি করতে বলতে চেষ্টা করেছিল দাদার এখানে শ্বশুরবাড়ি বুঝি? নাকি মামার বাড়িটাড়ি?

দাদা তাদের দিকে অবজ্ঞা দৃষ্টি হেনে স্টার্ট-এর গর্জন তুলে দিলো। হয়তো চালকের আসনে বসলেই মানুষের মধ্যে এরকম মদগর্বভাব এসে যায়। তা সেই যে আসনে যে চালকই হোক। কথাটা মনে হয়েছিল গৌতমের তখন। স্টিয়ারিং ধরার সঙ্গে সঙ্গেই এই অহমিকার সঞ্চার। হতেই হবে। হলেই বা বাসচালক—এতগুলো লোকের জীবন মরণ ওর একার হাতে না।

সেই তখন দেরী, খানিক পরে আবার বাস বদলের সময় ন্যায়সংগতভাবে কিছু দেরী। সেখানেও চায়ের দোকান ছিল, দেখে মনে হলো অপেক্ষাকৃত ভালো। কিন্তু তখন আর সেদিকে তাকাতে ইচ্ছে করল না গৌতমের। খানিক আগে খাওয়া সেই পাঁচনটা তখন সারা শরীরে পাক দিচ্ছে।

চিত্ত যে এই রাস্তা এই দোকান, ড্রাইভারের এই বেপরোয়া ব্যবহারে বেশ অভ্যস্ত, তা তাকে দেখে বোঝা গিয়েছে। প্রায়ই আসে বোধহয়। যতদিন গৌতম ওর খবর রাখে নি, ততদিনই কি চিত্ত কলকাতা ছাড়া? এইদিকেই কি তার অজ্ঞাতবাসের ভূমি?

এই যে সব চেকলুঙ্গি হাফ শার্টেরা, এরা এগিয়ে এসে চিত্তর সঙ্গে কথা বলতে না এলেও মনে হচ্ছে চেনে জানে। পরিচয় যদি নাও থাকে, অপরিচিত নয়।

এদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তার সূত্রে ধরা যাচ্ছে এরা সব চাষীবাসী ব্যাপারী। ক্ষেতের শাকপাতা আনাজপাতি, কচু কুমড়ো পান পটল, ডিম মুরগী, এই সবে ঝোড়া বোঝাই দিয়ে শেষরাত্রের ট্রেনে অর্থাৎ বাজারগাড়িতে বেরিয়ে পড়ে কলকাতা অভিমুখে। সেখানে পৌঁছেই দুমদাম পাইকারদের হাতে সে সব নামিয়ে দিয়ে খালি ঝোড়া আর ভরা ট্যাঁক নিয়ে ফিরে আসে সকালের এই বাসে। সকালে সেই ভোরবেলার ট্রেন ভিন্ন বেলা এগারটার আগে নাকি আর এ অঞ্চলের ট্রেন নেই।

এসবই গৌতম ওদের কথার ভগ্নাংশ থেকে জানতে পারছিল।

বাস যেখানে শেষ নিশ্বাস নিল, সেই জায়গাটার নাম একটা অদ্ভুত শব্দ মাত্র।

গৌতম বলল, 'তেঙ্গুটি' মানে কী রে চিত্ত?

চিত্ত বলল, বাংলাদেশের সব গ্রামের নামের মানে খুঁজতে চাইলে সুনীতি চাটুয্যেও হেরে যেতেন। হবে কোনো কিছুর অপভ্রংশ।

গৌতম তখন ভাবতে থাকল কোন্ শব্দ থেকে এটা আসতে পারে? এই সময় খুব খানিকটা কলরোল চলল। বাসের মাথা থেকে যার যার ঝোড়া-ঝুড়ি নামানো, ঠিকঠিক মতো চিনে নেওয়া এ তো আর নিঃশব্দে হবার

কথা নয়।

চিত্ত বলল, এবার আমাদের হাঁটতে হবে।

হাঁটতে হবে? সে আবার কতখানি?

যেতে যেতেই বুঝতে পারবি।

বাস আর যায় না?

গেলে হাঁটতে যাব কেন?

আরে বাবা, তোর সেই জাহান্নমটা এখান থেকে আরো কতখানি সেটাই জানতে চাইছি।

চিত্ত বলল, মেপে দেখি নি। যেতে যেতেই জানতে পারবি।

তা জানতে পারল বটে গৌতম নামের 'মন্ত্রাহত' ছেলেটা। মন্ত্র ছাড়া আর কি? যাদুমন্ত্র। একবারও তো বলতে পারছে না, দোহাই ভাই, তোমার সাধের জাহান্নমে তুমি যাও। আমায় ছেড়ে দাও।

হাঁটাটা অপ্রত্যাশিত বলেই আরো এত খারাপ লাগছে। ছাত্রজীবনে এমন অনেকবারই চিত্তর পাল্লায় পড়েছে বটে, কিন্তু তখন পারা সহজ ছিল। এখন সহজ লাগছে না। তাও যদি প্রথম থেকে জানতো, মনের মধ্যে একটা প্রস্তুতি থাকতো।

ভেবেছিল, বাস থামবে, সবাই নামবে, গৌতমরাও নেমে পড়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে। তা নয় এ কী!

ধুলো উড়ছিল দুরন্তবেগে, কারণ এটা হওয়ার মাস। গলার মধ্যেটা শুকিয়ে কাঠ তার মধ্যেই সোঁদা সোঁদা ধুলোর গন্ধ। পাজী চিত্তটা, অন্তত বাড়ি থেকে একটা ওয়াটার বটলও আনতে বলতে পারতো। ওর তো এ পরিস্থিতি অজানা নয়।

নাঃ অসহ্য! লজ্জা রাখা চলছে না।

মরীয়া হয়ে বলে উঠলো, আশেপাশে কোথাও টিউবওয়েল নেই?

টিউবওয়েল!

চিত্ত নাক ভুরু কুঁচকে বললো, জায়গাটা দেখে মনে হচ্ছে বুঝি মোড়ে মোড়ে টিউবওয়েল বসানো আছে?

বাঃ! সরকারের গ্রামোন্নয়ন বিভাগ থেকে তো শুনি গ্রামে গ্রামে হাজার হাজার নলকূপ—

গুলি মারো গ্রামোন্নয়ন বিভাগে—

চিত্ত আগুন আগুন গলায় বলে উঠলো, এদিকের পাঁচখানা গ্রামের মধ্যে একফুট নলও দেখতে পাবি না।

আশ্চর্য!

আশ্চর্য? এখনো আশ্চর্য হবার বিলাসিতা আছে?

থাকবার কথা নয় বোধহয়। কিন্তু আমার যে বেজায় তেষ্টা পেয়ে গেছে—

পেতে দে!

দারুণ পেয়েছে।

দারুণ নিদারুণ, যাই হোক, এখন বলে লাভ নেই। আরো খানিকটা হাঁটলে, তবে একটা পুকুর পাওয়া যাবে।

পুকুর!

গৌতম যদি এতে বিদ্যুতের শক্ খায়, দোষ দেওয়া যায় কী? দোষ দেওয়া গেলেও সে তীব্র প্রশ্ন করলো, খাবার জন্যে পুকুরের আশ্বাস দেখাচ্ছিস?

পুকুরের জল খাব?

চিত্ত তাচ্ছিল্যের গলায় বললো, তাছাড়া? এখানে লোকের তো পুকুরই ভরসা। তাই কি জল থাকে? এখনই শুকোতে শুরু করেছে। মে জুনে জল তো ছার কাদাও উঠবে না।

এতক্ষণে গৌতম চড়ে ওঠে।

বিদ্রোহের গলায় বলে ওঠে, তোর মতলবটা কি বল্‌তো? খুন-টুন করবার চেষ্টায় ভুলিয়ে নিয়ে এলি নাকি? 'জাহান্নম' দেখা আমার হয়ে গেছে, ফিরে যাচ্ছি।

পারিস তো যা। আমি তো যাচ্ছি না।

গৌতম হতাশ গলায় বললো, এখানে যে সাইকেল রিকশ পাওয়া যাবে, তাও তো মনে হচ্ছে না।

চিত্ত ঠোঁট বাঁকিয়ে একটু ব্যঙ্গ হাসি হাসলো, যাক, এতক্ষণে একটা বুদ্ধি-

সুদ্ধিওলা লোকের মতো কথা বললি। সাইকেল রিকশ পাওয়া যায় সেই 'তেঙ্গুটি' ইস্ট-এ। যেদিকে বাসগুলো চলে গেল।
ওঃ। এটা বুঝি তোর তেঙ্গুটি ওয়েষ্ট ?
না। এটা তেঙ্গুটির ইষ্ট ওয়েষ্ট নর্থ সাউথ কিছুই না। এখানটাকে বলে 'জলটুভি'।

দ্বিজোত্তম যখন অফিস থেকে ফিরলেন, রুবি উসখুস করলেও মায়ের চোখ-টেপা দেখে থেমে গেল, বলে বসল না ছোড়দার কথা। অথচ না বলে বসে থাকাও তো শক্ত।
অমিতা এদিকে চলে এসে স্বামীর চা জলখাবার গোছাতে গোছাতে চাপা গলায় বললেন, মানুষটা সারাদিনের পর তেতে পুড়ে এলো, এক্ষুনি ভাবনা-চিন্তার কথাটা বলতে বসছিলি কেন ? আগে চা-টা অন্তত খেতে দে।
রুবি ঠোঁট আর দু হাত উল্টে বললো, চমৎকার ! এই তো একটু আগে দুর্ভাবনায় কাঁদতে বসছিলে। কী করে বুঝবো তোমার কাছে কোন্‌টা জরুরি।
অমিতা মনে মনে বললেন, এখন বুঝবে না মা, বুঝবে পরে। কিন্তু স্বামীর চা খাওয়াটাই বেশী জরুরি বলেই কি মেয়েকে থামালেন অমিতা ? ছেলের দোষ ঢাকার উদ্দেশ্যও কি ছিল না ? চা খাওয়ার কালে যদি অমিতা দ্বিজোত্তমকে এটা ওটা কথায় কিছুক্ষণ ভুলিয়ে রাখতে পারেন এবং সেই সময়টার মধ্যে গৌতম এসে যায়, তাহলে তো আর কোনো ব্যাপারই ঘটতে পারে না। অমিতা অনায়াসেই তাড়াতাড়ি ছেলেকে বকে উঠতে পারবেন, হ্যাঁরে, সেই কোন্ কালে বেরিয়েছিলি এতক্ষণে বাড়ির কথা মনে পড়লো ?
সেই কোন্ কালটা যে ঘড়ির কোন্ কাল সেটা গোলে হরিবোলে উহ্য থেকে যাবে, পরিস্থিতি সহজ হয়ে যাবে। অমিতা তাই মেয়েকে নিবৃত্ত করলেন। একটা মস্ত সুবিধে বড় ছেলে বড় বৌ অনুপস্থিত। অর্থাৎ দু জোড়া শ্যেনদৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে। তাদের সেই দৃষ্টিলব্ধ

মূলধনকে কাজে লাগিয়ে অমিতার ছোট ছেলে সম্পর্কে যে সব তাক্ষ্ণ কটাক্ষ, তীব্র মন্তব্য নিক্ষিপ্ত হতে পারতো সেটা হতে পারে নি। ইতিমধ্যে হতভাগা নির্বুদ্ধির রাজা ছেলেটা যদি এসে পড়ে, ওই প্রবল একজোড়া বিরুদ্ধবাদী সমালোচকের খপ্পরে পড়তে হবে না।

যদিও অমিতা বড়ছেলের এই নিয়মিত সপ্তাহান্তে বৌ নিয়ে শ্বশুর বাড়ি যাওয়াকে 'শনিপুজো' দিতে যাচ্ছে বলে ব্যঙ্গ করেন, তবু এই যাওয়াটায় মনে মনে পরম স্বস্তি বোধ করেন। ছুটির দেড়দিন অন্ততঃ অমিতার ছোট ছেলে আর মেয়ের গতিবিধির হিসেব কোনো বিশেষ খাতায় জমা পড়ে না।

প্রাণের মধ্যে হু-হু করছে, সারাদিনের অস্নাত অভুক্ত ছেলেটার চেহারাটা ভাবতে গিয়ে ডুকরে কান্না আসছে, পথে বেরিয়ে জগতে যতরকম বিপদ ঘটা সম্ভব সেইগুলো ভীড় করে চোখের সামনে ঠেলে ঠেলে উঠছে তার কেন্দ্রবিন্দুতে গৌতম নামের ছেলেটাকে বসিয়ে তবু স্থির থাকতে চেষ্টা।

যানবাহনের দুর্ঘটনার কথা তো ছেড়েই দাও, আরো কতরকম ভয়াবহ ঘটনাও তো আকছার ঘটতে দেখছেন অমিতা। শুনছেন, পড়ছেন।

বন্ধু, একান্ত পরিচিত বন্ধু, হঠাৎ ডেকে নিয়ে গেল, হয়তো বাড়াভাত পড়ে রইল, আর ফিরল না ছেলে! হয়তো চিরতরেই লুপ্ত হয়ে গেল সেই প্রাণপুতুল মূর্তিটুকু। হয়তো বা দু-চারদিন পরে কোথাও তার লাশ পাওয়া গেল বিকৃত গলিত, সনাক্তের অযোগ্য।

এও তো বন্ধুই ডেকে নিয়ে গেল।

'কাল' বন্ধু। অমিতার বরাবরের বিরক্তিকর ওই পাজী ছেলেটা! গৌতমকে যেন কেনা গোলাম বানিয়ে রপটে বেরিয়েছে। অনেকদিন আর দেখা যায় নি হাড়ে বাতাস লেগেছিল অমিতার। হঠাৎ আজ আবার কোথা থেকে উদয় হয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে টেনে নিয়ে গেল!

চা-টুকু পর্যন্ত—

মুখে আঁচল দিয়ে ডুকরে ওঠাটা সামলে নিলেন অমিতা।

অমিতার ভিতর থেকে যেন আর্তনাদ উঠছে, এটাই কুলক্ষণ। এটাই পরম

অমঙ্গলের চিহ্ন। চিরকালের নিয়ম বাসিমুখে বাড়ি থেকে বেরোতে নেই। আমি কেন জোর করলুম না গো—

অমিতার মনে হয় বুকের মধ্যে কে যেন করাত চালাচ্ছে কেন নিজে বেরিয়ে দেখলাম না সেই শনি বন্ধুটার তখন চোখ মুখের চেহারাটা কি রকম ছিল। খুনের চিন্তা মাথায় নিয়ে কেউ যদি—তখন কি তার চেহারায়? বীভৎসতার রূপ কী?

আঃ ভগবান! আমি কেন এত ভয়ানক কথাগুলো ভাবছি! নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে অবিরত ঠাকুরের নাম করতে থাকেন অমিতা কিছুতেই যেন তার ফাঁক দিয়ে অমঙ্গল চিন্তা উঁকি দিতে না পারে।

তবু অমিতা দ্বিজোত্তমের কাছে এসে বসতে চেষ্টা করলেন। বললেন, তোমাদের অফিস যে শুনেছিলাম কাছাকাছি কোথায় উঠে আসবে! এলে তো বাঁচা যায়।

দ্বিজোত্তম হাসলেন, বললেন, উঠে আসতে আমার লীলাখেলা ফুরোবার সময় হয়ে আসবে। বণ্ডেল রোডে জমি যোগাড় হয়েছে, এই পর্যন্ত—

সন্দেশটা ফেলছ কেন?

বলি দুটো করে মিষ্টি দিও না, ছাড়বে না তো। এ বয়সে বেশী মিষ্টি খাওয়া ঠিক নয়।

আচ্ছা, কাল থেকে আর দেবো না, আজ তো খাও।

ছাড়াছাড়া শুকনো কথা।

তবে দ্বিজোত্তম ঠিক ধরতে পারেন না এই বেলক্ষণ!

জলের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতেই প্রশ্ন করলেন দ্বিজোত্তম, এরা বুঝি এখনো ফেরে নি?

বলে ফেলেই ভাবলেন, বলাটা ঠিক হলো না। অমিতাকে কতকগুলো কথা বলার স্কোপ দেওয়া হয়ে গেল। যে কথাগুলো শ্রুতিসুখকর নয়। এমনিতেই তো অধিক কথায় অনীহা দ্বিজোত্তমের। তার উপর আবার যদি সে কথা অভিযোগমূলক হয়।

অসতর্কে দ্বিজোত্তম এক ঝাঁক অভিযোগের খাঁচার দরজা খুলে দিলেন।

অবশ্যই এখন অমিতা স্বামীর এই নেহাত সহজ প্রশ্নটার সোজাসুজি উত্তর না দিয়ে প্রতি প্রশ্ন করতে থাকবেন, কবে তাঁর ছেলে বৌ এ সময় ফেরে? কবে ভাবে মায়েরও কখনো ছুটিছাটার দিনে সাধ হতে পারে বড় ছেলে বাড়িতে থাকুক তিন ভাই বোনে একসঙ্গে ভাত খাক।

শুনতে পাওয়া যায় শ্বশুরবাড়ি গিয়ে শালী শালাজদের নিয়ে থিয়েটার সিনেমা দেখায়। কই কখনো তো ইচ্ছে হয় না ছোট বোনটাকে কিছু করি। শাড়িটা জামাটা যদি দেয়ও কখনো, তো কখনো নিজে হাতে করে নয়, সেই বৌয়ের হাত দিয়ে। এ খেয়াল হয় না 'দাদা' ভালবেসে ডেকে কিছু দিলে যে আনন্দ, 'বৌদি' দিলে সে আনন্দের সিকির সিকিও হয় না।

আর মায়ের কথা তো বাদই দাও।

কবার বা 'মা' বলে ডাকে?

কার্যকারণ সূত্রহীন এমন বহু প্রশ্ন উথলে ওঠে অমিতার সামান্য সুযোগ পেলেই।

তাই আপন অসতর্কতায় শঙ্কিত হলেন দ্বিজোত্তম। কিন্তু দ্বিজোত্তমের সৌভাগ্য, অমিতা আজ একটা সহজ উত্তর দিলেন। সংক্ষিপ্তও।

বললেন, রাতের খাওয়াটা সুদ্ধ না খাইয়ে তো মেয়ে জামাইকে ছাড়েন না বেয়ান।

অমিতার পক্ষে এটাই সংক্ষিপ্ত, এবং এটাই আমিষ গন্ধবিহীন।

দ্বিজোত্তম অতএব একটু মধুর রসের স্বাদ পাবার সুযোগ পেলেন। অথবা নিলেন। হেসে বললেন, তোমার জামাই হলেও তুমি ছাড়বে না।

অমিতা বললেন, আমার ভাগ্যে কেমন জামাই হবে ভগবান জানেন। হয়তো মোটেই 'গায়ে পড়া হবে না, নেহাত জামাই জামাই' হবে। নিশ্বাস ফেললেন একটা।

দ্বিজোত্তমের আজ অফিসে একটা সুখবর ছিল, একটা মেসিন বিগড়ে বসে-ছিল কতদিন ধরে অকস্মাৎ কেমন চালু হয়ে গেল। আর হলো দ্বিজোত্তমেরই বুদ্ধিতে। তাই মনটা একটু হালকা ছিল। তাই মুখে এসে যাচ্ছিল, তার

মানে শাশুড়ীদের কাছে 'গায়ে পড়া' জামাই-ই কাম্য। জামাইয়ের 'জামাই জামাই' হওয়াটা প্রশংসনীয় নয়! কিন্তু সামলে নিলেন। থাক, তুচ্ছ একটু পরিহাসের সূত্রে আবার কোন্ বন্ধ খাঁচার দরজা খুলে পড়ে।

তাই অন্য প্রসঙ্গে এলেন।

বললেন, এখনকার ছেলেদের যে কী খামখেয়াল। আজ গৌতমের এক বন্ধু বেড়াতে এসেছিল—কখন জানো ? আমি যখন—

অমিতা তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন, বললেন, গেটের শব্দ হলো মনে হলো। ওরা বোধহয়—

চলে গেলেন সিঁড়ির দিকে।

'শব্দ' শোনাটা কি ছলনা মাত্র ?

ভয়ঙ্কর একটা শব্দ কি শুনতে পাচ্ছেন না অমিতা? সমুদ্রের ঢেউ আছড়ানোর মতো ? ভীষণ জোরে ইঞ্জিন চলার মতো! আসলে সেটা দু-দুটো ভয়ের সংঘর্ষের শব্দ।

এক ভয় সেই ছেলেটার জন্যে, (যার কথা ভাবতে গেলেই অমিতা কেবল তার ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মূর্তিটাই দেখতে পাচ্ছেন।) আর ভয়, এই ভয়ঙ্কর খবরটা এতক্ষণ স্বামীর কাছে চেপে রাখবার জন্যে ধিকৃত হবার।

প্রকাশ তো হয়ে যাবে।

এখনই প্রকাশ হয়ে যাবে।

উত্তম আর উত্তমের বৌ ফিরলেই উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে অমিতার বাতাবরণ। রাত করে ফিরবে উত্তম, আর ফিরেই জিগ্যেস করবে, গেট বন্ধ করবে কিনা।

দ্বিজোত্তমের এ সময় একটু বই পড়ার সময়, তাই যখন দেখলেন গেটের শব্দটার কোনো ফসল ফললো না এবং অমিতাও ফিরে এলেন না, তখন বই নিয়ে বারান্দার চেয়ারে গিয়ে বসলেন। বুঝলেন অমিতা কোনো কাজে জুড়ে গেছেন।

এ বারান্দাটা রাস্তার ধারের নয়।

শোবার ঘর সংলগ্ন ছোট্ট একটু বারান্দা, যেখান থেকে বাড়ির পিছনের

আট ফুট ছাড়া জমিটুকু দেখা যায়। আগে দু চারটে টুকটাক গাছ ছিল, সম্প্রতি তিনতলায় ঘর তোলা বাবদ ইট কাঠ বালি চুন ইত্যাদির সমাধি-ক্ষেত্র হয়েছে। কিন্তু নীচেকার ওই দৃশ্যের তারতম্যে কিছু এসে যায় না দ্বিজোত্তমের, বাতাসটা তো আসে উপর থেকে। আসছে সেই বাতাস বড় মনোরম। বেতের চেয়ারটাকে আলোর নীচে টেনে নিয়ে বসলেন নিশ্চিন্ত মনটি নিয়ে। জানেন ছোট পুত্তুর বেড়িয়ে ফিরলেই অমিতা খাবার ডাক দেবেন। অবশ্য বেড়িয়ে ফিরতে পুত্তুরের প্রায়ই দেরী হয়। দ্বিজোত্তমের শেষ রাত্রিতে উঠে অফিস যাবার প্রস্তুতি, তাকে অমিতা আগে খেয়ে নিতে বলেন, দ্বিজোত্তম ইচ্ছুক হন না।

একদিন শুধু বলেছিলেন, ফাঁকা টেবিলে একা খেতে বসলে মনটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে।

অমিতা বলেছিলেন, তা খেতে বসে গল্প করতেও তো দেখ না।

দ্বিজোত্তম হেসেছিলেন, তোমরা গল্প করো আমি সেটা দেখি।

তা সবদিনই কি আর সেটা দেখতে পান দ্বিজোত্তম।

শনি, রবি দুদিন তো উত্তম দম্পতির রুটিন অন্য। অমিতারও মাঝে মাঝেই বার ব্রত উপোস-টুপোস। তবে রুবি একাই একশো এই যা। কিন্তু আজ রুবি এমন নিঃসাড় কেন?

ভাবলেন দ্বিজোত্তম, সবদিন তো বাবা ফিরলেই বেশ খানিকটা বকবক করে যায় মেয়েটা! বেশীর ভাগই সারাদিনের খবর পেশ। বাড়ির, পাড়ার, খবরের কাগজে পড়া দেশের দশের।

দ্বিজোত্তম কখনো হাসিমুখে বলেন, এবার থামা দে, বইটা একটু পড়ি। আজ হয়তো মায়ে মেয়েয় বিশেষ কোনো রান্নাই করছে।

কিছু একটা কারণ ভেবে নেওয়া, এটাই স্বভাব দ্বিজোত্তমের। ডেকে হেঁকে জিজ্ঞেস করতে যান না। আজও গেলেন না। বললেন না, 'গেট-এর শব্দ হলো বললে, কই? কে এলো?'

বইয়ের পাতাগুলো বাতাসে ফরফরিয়ে উঠতে চাইছে, কোনো দুটো আঙুলের ডগায় চেপে ধরে। আস্তে আস্তে তলিয়ে গেলেন তার মধ্যে।

সেই ডুবে থাকা মনেও একটা সুন্দর স্নিগ্ধ অনুভূতি। শান্তির, তৃপ্তির। এই বাড়িটি তিনি আস্তে আস্তে গড়ে তুলেছেন স্বোপার্জিত অর্থে। জমি কিনেছেন খুঁজে খুঁজে মনের মতো জায়গায়।

তখন টাকাকড়ি বেশী ছিল না, ওরই মধ্যে যতটা সম্ভব শোভা সৌন্দর্য বজায় রাখবার চেষ্টা করেছেন, ক্রমশঃ আস্তে আস্তে কিছু কিছু বাড়াচ্ছেন। সকলের যাতে সুবিধে হয়। আরামে থাকে তার দিকে দৃষ্টি রেখেছেন।

দক্ষিণ দিকের সবচেয়ে বড় বলতে গেলে বাড়ির প্রধান ঘরটাই বড় ছেলে বৌয়ের নামে বানিয়েছিলেন, ছেলের বিয়ে হওয়ার পর সেটা তাদের দখলে চলে গেছে। এতদিনে আবার তিনতলায় তেমনি একখানা ঘর তুলেছেন ছোট ছেলের জন্যে। মেয়ের জন্যেও ছোট একটি ঘর বরাদ্দ আছে, যেটা তার মা বাপের ঘরের সঙ্গে খোলা দরজা দিয়ে যুক্ত। লেখাপড়া গান সবই তার নিজের ঘরে। নিজেদের জন্যে এদিকের ঘরটি যার এক কোণে মাত্র একটা দক্ষিণমুখী জানলা, বাকি সব উত্তরমুখী! যে ব্যবস্থার জন্যে অমিতা মনে মনে একটু ক্ষুব্ধ।

যখন উত্তমের বিয়ে হয় নি, উত্তম গৌতম দুই ভাই একসঙ্গে থেকেছে, তখন অমিতার 'বড় ছেলের জন্যে বড় ঘর ভালো ঘর, ভাবতে ভালো লেগেছে। ছোটকে শুনিয়ে বলেছেন, 'জ্যেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ ভাগ' এটা শাস্ত্রের নিয়ম।

কিন্তু এখন, ওই ঘরের মালিকানা আসা অবধি অমিতার যেন তেমন সুখ নেই। তবে স্বামীর কাছে সেই অ-সুখের কথা ব্যক্ত করতে লজ্জা করে। যে মানুষ, স্ত্রীর সুবিধে অসুবিধে দেখবেন না, বরং এতে তাঁকে নীচু চোখে দেখবেন। অমিতার বোনেরাও তো বলেছে। জামাইবাবুর যেমন কাণ্ড! বাড়ির কর্তা এত কষ্ট করে বাড়ি করলেন, নিজের দিকটা, একটু দেখবেন তো?

তা বোনের কথার উদ্ধৃতি দিয়ে কথাটা দ্বিজোত্তমের কানে তোলায় দ্বিজোত্তম মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'নিজের দিকটা দেখি নি কে বলল? এই যে পুবের এই ঝোলা বারান্দাটি? যার চারদিক থেকে হাওয়া আসে। স্রেফ স্বার্থ-পরের মতো নিজেদের জন্যে রেখেছি না। বলতে কি শুধু দুজনের কথা

ভেবেই বানিয়েছি।'

কিন্তু অমিতা আবার কবে ওই ঘরের মধ্যে দিয়ে পার হয়ে লোক লোচনের আড়ালে পড়ে থাকা বারান্দাটুকুতে বসতে যান? ভোগ উপভোগ যা কিছু করতে ওই কর্তাই করেন।

আলো থাকলে পড়েন, লোডশেডিং হলে চুপচাপ ইজিচেয়ারটিতে পড়ে থাকেন। দু অবস্থাতেই মুখের রেখায় ফুটে থাকে একটি স্নিগ্ধ ছাপ। শান্তির, পরিতৃপ্তির। তিনতলার অংশটুকু তৈরী হওয়ার পর যেন এই পরিতৃপ্তির ছাপটি বেশী পরিস্ফুট। বড় ভাইয়ের বিয়ের পর সে একটু উদ্বাস্তু হয়ে গিয়েছিল।

হৈ চৈ ধুম ধড়াক্কা করে কখনো কিছু করেন না দ্বিজোত্তম নামের মানুষটি। কারো সঙ্গে পরামর্শ করার আড়ম্বরে বেশী কথার চাষও করেন না, যা করেন প্রায় নিঃশব্দে। অথচ কার কি দরকার, কার কি ইচ্ছে বুঝেও যান ঠিক

অবশ্য সংসারে, সবাইয়ের সন্তোষবিধান স্বয়ং ভগবানেরও আছে কিনা ভগবানই জানেন, তবে এই মানুষটি যেন আপন অন্তরের সন্তোষ দিয়ে সেই 'অদৃশ্য অসন্তোষ'গুলোর শূন্যতাটা অনুভবের বাইরে রাখেন। উনি জানেন জীবনকে 'অবস্থার' ছাঁচেই ঢালাই করতে হয়। তারপর সেই জীবনের গায়ে কারুকার্য করাটা ইচ্ছে রুচির আর অধ্যবসায়ের। খুব একটা কাব্য সাহিত্য ঘেঁষা ভালো ভালো কথা জানেন না দ্বিজোত্তম, কিন্তু তাঁর নিজস্ব অনুভূতি বলে জীবনটাকে গড়ে তোলাও একটা শিল্প-কাজের মতো।

কারো ইচ্ছের উপর জুলুম করা, কারোকে দোষারোপ করা, সংসার সদস্যরা গৃহকর্তার বশ্যতা স্বীকার করে চলবে, এমন কথা দ্বিজোত্তম ভাবতেই পারেন না। অমিতার সঙ্গে হয়তো তাঁর মনের সুর মেলে না কিন্তু তার জন্যে আক্ষেপও নেই। সুর মেলানোর চেষ্টাও করতে যান না। জানেন সৃষ্টিকর্তা যাকে যেমন গড়েছেন।

অমিতা সম্পর্কে দ্বিজোত্তমের বিরক্তি নেই বিতৃষ্ণাও নেই, যেটা আছে

সেটা হলো একটু 'স্নেহ স্নেহ করুণা!'

অতএব সুখী হতে আটকায় না দ্বিজোত্তমের।

সেই সুখী মুখটি নিয়েই তাঁর দিনরাত্রি আবর্তিত হতে থাকে।

এখন এই নিশ্চিত বিশ্রামের সময়, সেই ছাপটির পালিশে মুখটি বড় মসৃণ দেখাচ্ছে। এই মসৃণতার ভাষা হচ্ছে—পৃথিবী কী সুন্দর। জীবন কত মধুর!

হয়তো পৃথিবীর সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখবার, জীবনের মাধুর্য বজায় রাখবার ক্ষমতা মানুষের নিজের হাতেই থাকে, শুধু সবই সে ক্ষমতার খবর রাখে না বলেই সৌন্দর্য আর মাধুর্য হারিয়ে রিক্ত মূর্তিতে ঘুরে বেড়ায়।

কিন্তু দুঃখ দারিদ্র্য ভাগ্যের নিষ্করুণতা? বিধাতার রোষ অভিশাপ?

আছে বৈকি। সবই আছে।

শুধু সেগুলো যে আছে, থাকে, সেটা জানা থাকলেই হলো! তারপর তো আছেই লড়াই। লড়বার জন্যেই তো পৃথিবীর ভূমিতে পা রাখা। কিন্তু সে লড়াই কি মানুষের সঙ্গে? না ভাগ্যদেবতার সঙ্গে? সত্তার গভীরে যদি এই পণ থাকে 'কিছুতেই হার মানব না!' তবে সাধ্য কি তাঁর হারিয়ে দেন?

অবশ্যই এতো সব কথা-টথা জানেন না—দ্বিজোত্তম নামের মানুষটা। ওগুলো ওঁর সহজাত। কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন কর্মেরই জোরে। সেই কর্ম-ক্ষেত্রে ভালবাসা আর ঈর্ষা দুটোই জুটেছে প্রায় সমানভাবেই। দ্বিজোত্তম একটাকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে থাকেন, অন্যটাকে 'প্রাপ্য পাওনা' বলে বহন করে চলেন।

অবশ্য মানুষের এই সংসারে দ্বিজোত্তমের একটাই মাত্র পরিচয়, কাজপাগল আর নির্বিরোধী। নিস্তেজ বলেই নির্বিরোধী।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত অমিতা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিলেন। তাঁর বড়-ছেলের ফেরাটা যেন বিলম্বিত হয়। যেন সেই অবকাশটুকুর মধ্যে ছোট ছেলে তাঁর মুখরক্ষা করে। কিন্তু সে প্রার্থনা ভগবানের কানে পৌঁছচ্ছে

না দেখে হঠাৎই একসময় প্রার্থনার বিষয়বস্তুটা বদলে গেল। কখন থেকে যেন অমিতা ভগবানের কাছে প্রার্থনা শুরু করলেন, বড় ছেলের ফেরাটা ত্বরান্বিত হোক। যত দেরী হবে ততই তো হারিয়ে যাওয়া ছেলেটাকে খুঁজতে বেরোনোর পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

রুবি ঠায় বাইরের দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল, গেট-এ চোখ ফেলে। একসময়ে চলে এসে মার বিছানার কাছে দাঁড়িয়ে রেগে বলল, বাবাকে বলছ না-ই বা কেন?

অমিতা বিছানাই নিয়েছিলেন, আস্তে উঠে বসে বললেন, ওঁকে বলে কী হবে?

কী হবে মানে? কিছু তো একটা করতে হবে। কোথাও ফোন-টোন করা, কি—

থেমে গেল।

গলাটা বুজে এলো বলেই থেমে গেল।

অমিতা প্রায় ভুকরে উঠে বললেন, কিছু করবেন না ওই মানুষ। এতকাল ধরে দেখছি তো। বলবেন এত ভাবনার কী আছে? বন্ধুর সঙ্গে গেছে, কোথাও গিয়ে পড়ে আটকে গেছে আর কি।

রুবি বসে পড়ে বলে, ঠিক এই সময় গগনটাও দেশে গিয়ে বসে আছে। আর দাদাটাও এত নির্লজ্জ হয়েছে! উঃ! ঘরজামাই হলেই ভালো ছিল ওর। শ্বশুরবাড়ি যেন স্বর্গভূমি—

হোক বড় ভাই, তবু রাগের সময় মানুষ কাকে কী না বলে! বিশেষ করে মেয়েমানুষ!

কিন্তু যা বলেছে রুবি সেটা কি খুব অন্যায় বলেছে?

এই রাত এগারোটায় নিখিলবাবুর চাকর খবর দিতে এলো, 'এ বাড়ির উত্তম দাদাবাবু শ্বশুরবাড়ি থেকে ফোন করে বলতে বললেন, মাদ্রাজ থেকে বৌদির দিদি না কে এসেছেন, আজ রাতে আর ওনারা ফিরবেন না। কাল সকালে আসবেন।

এরপর?

এরপর আর কী গতি আছে অমিতার, 'সেই মানুষটার কাছে গিয়ে আছড়ে পড়া ছাড়া ?

আছড়ে গিয়ে পড়লেন সেইখানে। যেখানে ভারী হয়ে আসা রাত্রির স্তব্ধ গাম্ভীর্যের গায়ে বৈশাখের নেশা লাগানো এলোমেলো বাতাস দুরন্ত শিশুর মতো লুটোপুটি ছুটোছুটি করছে আর দ্বিজোত্তম পড়তে পড়তে হঠাৎ বন্ধ করে বইটার পাতার মধ্যে আঙুল রেখে চুপ করে বসে ভাবছেন বড় বেশী বয়সে বই পড়ার অভ্যাসটা করেছি। জীবনের অনেকগুলো দিন ফুরিয়ে গেল।

তা মনে মনে যে চিন্তাই করুন, অমিতার ভবিষ্যৎবাণী সফল করলেন। স্ত্রী কন্যা দুজনকে অবাক করে দিয়ে অবাক গলায় বললেন, আমি এখন নিখিলবাবুর বাড়ি গিয়ে ফোন করে চলে আসতে বলব ওকে ? পাগল নাকি ? এসে কী করবে ? 'গৌতম' 'গৌতম' করে রাস্তায় রাস্তায় ডাক দিয়ে বেড়াবে ? এত অস্থির হবার কী আছে ? বিপদের কথাই বা ভাবছ কেন ? ওই বন্ধুটির পাল্লায় পড়ে এরকম তো আগেও করেছে—কলকাতা ছাড়িয়ে কোথাও গিয়ে পড়েছে হয়তো।

আর বড় ছেলেকে যখন অমিতা 'বেহায়া হতভাগা কুলাঙ্গার' বিশেষণ বিভূষিত করছেন। তখন আরো অবাক হয়ে বললেন, কী আশ্চর্য ! দূর থেকে হঠাৎ আপনজন এসে পড়লে, বৌমার তো থেকে যাবার ইচ্ছে হওয়াই স্বাভাবিক। এমন তো নয় তুমি ওদের জন্যে রান্নাবান্না করে খাবার নিয়ে বসে আছ।

অমিতার বেশী রাগ আসে এই নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে। কড়া গলায় বলে ওঠেন, তা যার 'আপনজন' সে না হয় বসে থাকলো। এই বেহায়াটার বসে থাকবার কী দরকার ? ও চলে আসতে পারত না ?

এতে দ্বিজোত্তম একটু গম্ভীর হলেন। বললেন, কেন, শুধু বৌমারই আপনজন ? ওর নয় ? এই যে রুবি, ওকে কি বৌমার আপনজন বলা যাবে না ?

তবে নেমে অমিতার বুঝি সেই বুকচাপা ভয়ের ভারটা হঠাৎ একটু হালকা

হয়ে যায়। বলে ওঠেন চমৎকার! সেইটা আর এইটা এক হলো?
আমি তো একই দেখছি। একই তো সম্পর্ক। যাক গে আমি হয়তো ওসব ভালো বুঝি না। কিন্তু রাত তো অনেক হলো খাওয়া-টাওয়া হবে না?
খাওয়া।
অমিতার চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হলো।
তিনি যখন মনশ্চক্ষে ছেলের ছোরাবিদ্ধ শরীর অথবা গাড়ির চাকার তলায় পিষে যাওয়া মাথার দৃশ্য দেখতে দেখতে উদভ্রান্ত হয়ে উঠেছেন তখন এই মানুষটা খাওয়ার সময় উত্তীর্ণ হওয়ার কথা ভাবছে? কী হৃদয়হীন। কী চক্ষুলজ্জাহীন।
চেঁচিয়ে ওঠার ইচ্ছেটা সামলে ভারী গলায় বললেন, রুবি, তোর বাবাকে খেতে দিয়ে খেয়ে নিগে যা।
দ্বিজোত্তম বললেন, শুধু বাবাকে? মাকে নয় কেন?
আমি? আমার এখন খেতে বসার মতো মনের অবস্থা দেখছ।
দ্বিজোত্তম একটু হাসলেন, 'মনের অবস্থা' তো দেখা যায় না। তবে তুমি না খেয়ে বসে থাকলে যদি ছেলে তাড়াতাড়ি চলে আসবে মনে কর বলার কিছু নেই। দে রুবি আমাকেই দিয়ে দে। আবার তো সেই ভোরবেলা—কিন্তু আমার তো মনে হয় পেট খালি থাকলে ভয় ভাবনা রাগ, দুঃখ এরা বেশী করে চেপে ধরে। শত্রুকে প্রশয় দিয়ে বাড়িয়ে লাভ কী? যাকগে, যে যা বোঝে। রুবি দে বাবা, আমাকেই তবে দিয়ে দে।
অমিতা ভাবলেন কী হৃদয়হীন! কী হৃদয়হীন!

চড়া রোদ থেকে এসে নীচু খড়ের চালা ঘরটার মধ্যেটায় কিছুই প্রায় দেখা যাচ্ছিল না, বলতে গেলে ঘুটঘুটে অন্ধকার। অবশ্য তাছাড়া হবেই বা কী? আলো আসবার পথ বলতে তো ওই নীচু দরজাটা যাতে মাথা হেঁট করে ভিন্ন ঢোকা যায় না, আর তারই মুখোমুখি ও পিঠের দেওয়ালে কয়েকটা ঘুলঘুলি ছাড়া আর কিছু নেই।

মাথাটাকে বেশ কিছুটা হেঁট করে ঢুকতে হলো পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি গৌতমকে। চিত্তকে অবশ্য অতটা নয়। আর ওর তো ভঙ্গিটা অভ্যস্ত।

ঢুকে পড়ে প্রথমটা চোখে চোখঢাকা অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পেল না গৌতম। মিনিট খানেক পরে ওই ঘুলঘুলি দিয়ে এসে পড়া আলোর রেখাগুলোই কাজ দিলো।

দেওয়াল ঘেঁসা একটা সরু চৌকী শ্রীহীন একটু বিছানার উপর বিছানার সঙ্গে প্রায় মিশে থাকা যে মেয়েটি ওদের আসার সাড়া পেয়ে একটু আগেই উঠে বসেছিল তার মুখটা দেখতে পেল গৌতম।

যদিও এই অদ্ভুত অ-দৃষ্টপূর্ব পরিবেশ গৌতমকে যখন ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিতে চাইছে, তবু গৌতমের মনে হলো এ মুখ আগে দেখেছে।

আর একবার তাকাল গৌতম। এখন মনে হলো ঘুলঘুলিগুলো খুব অকর্মা নয়, ক্রমশই যেন আলোকদানে উদারহস্ত হচ্ছে। এখন মনে হলো, হ্যাঁ! নিশ্চয়। এ মুখ আমি আগে কোথাও দেখেছি। হ্যাঁ! হ্যাঁ ভুরুর ওপর ওই একটা তিল, ভীষণভাবে মনে পড়ছে।

কিন্তু কোথায় দেখেছি?

চিত্ত পাজীটা তো কিছুতেই একবারও বলে নি কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কেন নিয়ে যাচ্ছে। এই মেটে দাওয়া খড়ের চাল, আবোল তাবোল জিনিস দিয়ে বেড়া দেওয়া বাড়ি বললে বাড়ি ঝুপড়ি বললে ঝুপড়িটায় ঢুকে এসে বলল, চল দেখবি যাকে শ্মশানে নিয়ে যেতে হবে। মাথাটা একটু হেঁট করে ঢুকতে হবে।

গৌতম দাঁড়িয়ে পড়ে রুদ্ধ গলায় বলে উঠেছিল, সত্যিই কি মড়া ফেলে রেখে কলকাতায় ছুটেছিলি?

চিত্ত উত্তর দিয়েছিল আহা পুরো মড়া হলে কি আর ফেলে রেখে যাওয়া যেত? না, দরকারই হতো? টান মেরে বেড়ার বাইরে ফেলে দিলেই তো কাজ চুকে যেত। জায়গাটায় আর যা কিছুর অভাব থাক শেয়াল কুকুরের অভাব তো নেই!

সেই কথার পর এই ঢুকে আসা, এবং প্রথমেই চোখে অন্ধকার দেখা।

ক্রমে অন্ধকার সয়ে আসায় দেখা গেল বছর সাতাশ আটাশের মতো এক জীর্ণ-স্বাস্থ্য শীর্ণ মহিলা, পরনে একটা বিবর্ণ ঢলঢলে ব্লাউজ, আর একখানা তেমনি বিবর্ণ ছাপা শাড়ি। হাত দুখানা ন্যাড়া নয়, যৎসামান্য কিছু আছে, তবে সোনা-টোনা জাতীয় কিছু নয় অবশ্যই। সিঁথিতে সিঁদুর আছে কিনা দেখবার উপায় নেই, দেখবার কথা মনেও আসে নি গৌতমের। কিন্তু ভুরুর উপরকার ওই তিলটার দিকে তাকিয়ে স্মৃতির দরজায় ধাক্কা মারতে মারতে, হঠাৎ মনে হলো এই মুখটা যখন দেখেছিল, দুই ভুরুর মাঝখানে একটা বড়মতো লাল টকটকে টিপ ছিল। হয়তো বা সেইজন্যেই মুখটা খুব উজ্জ্বল উজ্জ্বল দেখেছিল।

কিন্তু কবে? কখন? কোথায়? কোন্ পরিস্থিতিতে।

কিন্তু দেখেছিল নিশ্চয়।

কে সঙ্গে ছিল? চিত্তই কি?

না কি অন্য কোথা? অন্য কোনোখানে?

দুজনের মধ্যে ইনট্রোডিউস করাবার দিক দিয়েও গেল না চিত্ত, শুধু মহিলাটিকেই উদ্দেশ করে বলে উঠলো, ব্যাপার কী? উঠে বসেছ দেখছি। ফের জীইয়ে উঠলে? নাকি পেত্নী হয়ে বসে আছ?

নাম বোঝা গেল না। সম্পর্কও না।

কারণ প্রশ্নটা বিনা সম্বোধনে।

শীর্ণ মুখে একটুখানি ব্যঙ্গ হাসির আভাস ফুটিয়ে উত্তর এলো পেত্নী কি আজ নতুন করে হয়েছি? কতদিন থেকেই তো পেত্নী হয়ে বসে ঘাড়ের রক্ত চুষছি।

তবুও তো অ্যানিমিয়া!···চিত্ত যেন ধিক্কারের গলায় বলল, যমের অরুচিদের এই রকমই হয়। যাক—এটাকে চিনতে পারছ?

মহিলা মৃদু হেসে বললেন, পারব না কেন? তা ওকে আবার এই দুর্দশার মধ্যে টেনে আনবার কী দরকার ছিল?

সবসময় সুদশা ভোগ করতে হবে, এটাই মানুষের জীবন নয়।

মহিলাটি বললেন, সে তো নয় দেখতেই পাচ্ছি! জীবন পণ করেই টের

পাচ্ছি। কিন্তু অকারণ কেন বেচারাকে কষ্ট দেওয়া ?

অকারণ কে বলল ? চিত্ত বলল, তোমার মড়াটা পোড়াবে বলে ডেকে এনেছি। একা পারি না পারি তাই সাহায্যের জন্যে।

বন্ধুর প্রতি ভালবাসাটা দেখছি গভীর।

চিত্ত অবলীলায় বলল, নিশ্চয় তো। তবে রাস্কেলটার সেটা বোঝবার ক্ষমতা আছে কিনা জানি না। মোটা মাইনের চাকরি করতে করতে বুদ্ধি গেঁজিয়ে যায় শুনেছি।

মহিলাটি মলিন গলায় বললেন, নিজে তো শেষ হতে বসেছ, আবার এ বেচারাকে এর মধ্যে টেনে আনা! দেখে কষ্ট হচ্ছে। তোমার তো সবই সহ্য হয়ে গেছে, এ বেচারা এখন নাইবে কোথায়, খাবে কি, আজই যদি ফিরতে না পারে শোবে কোথায় ! ছি ছি ! ভারী অন্যায়।

চিত্ত গম্ভীর হলো। গৌতমের দিকে তাকিয়ে বলল, এই শালা, এতবড় জীবনটার মধ্যে মাত্র একটা দিনের খাওয়া শোওয়ার অসুবিধেটা কি তোর মরণ তুল্য মনে হচ্ছে ?

ভিতরে ভিতরে হয়তো হচ্ছিল, দিশেহারা হয়েই ভাবছিল একগ্লাস পানীয় জল কী ভাবে চাওয়া যায়, কে দেবে, কী দেবে ? কিন্তু এ-প্রশ্নে একটু হেসে বলল, মরণের এক্সপিরিয়েন্স নেই, কী করে বলব ?

অর্থাৎ সোজা উত্তরটা এড়িয়ে গেল। বলে ওঠা উচিত ছিল তো না না সে কী ! তুই যেখানে থাকতে পারিস, সেখানে আমি একদিনে মারা যাব ?'

মহিলাটি বলে ওঠেন, যার সে এক্সপিরিয়েন্স আছে, তার কথা মানুন। আমি বলছি মরণতুল্য নয়, মরণঅধিক। তবে কি না জানেন তো মরার বাড়া গাল নেই ? সেই 'অধিকারটা'র পর আর কিছু গায়ে লাগে না।

গলার স্বর ক্ষীণ, একটু যেন হাঁফিয়েই পড়ছে, তবু বলার ভঙ্গিটা মার্জিত বুদ্ধিদীপ্ত।

এ ভঙ্গী পরিচিতের আভাস নিয়ে এলো।

স্মৃতির ঘরের তালাবন্ধ দরজাটায় হাতুড়ি পিটে চলে, কোথায় দেখেছি, কোথায় দেখেছি।

তবু তার মধ্যে থেকেই বলে ওঠে, ঠিক আছে। তাহলে সেই গায়ে না লাগার চেষ্টাটাই করা যাক।

(হ্যাঁ দেখেছি···মনে করতে পারছি ··নিশ্চয় মনে করতে পারছি···)

মহিলাটি হাসলেন, তাহলে তার প্রথম পাঠ হচ্ছে—পুকুরে গিয়ে স্নান করে আসা।

স্নান না করে চালানো যায় কিনা, সেটাও প্রথম পাঠ হতে পারে।

আপনাকে দেখে অবশ্য মনে হচ্ছে আমিই আপনাকে ধরে জলে চুবিয়ে আনি। যাক পুকুরে যেতে হবে না, জল এনে দেবে।

গৌতম চকিত হলো, কে এনে দেবে ?

ভয় নেই আপনার বন্ধুটি নয়। আছে লোক।

চিত্ত তাকিয়ে দেখছিল।

চিত্ত বলল, পোড়ার মুখে আজ কতদিন পরে হাসি দেখতে পাওয়া গেল তাই ভাবছি।

গৌতম ভাবতে চেষ্টা করল, কিন্তু এখন এদের সম্পর্কটা কী ?

মহিলাটি বললেন, তোমাকে গঞ্জনা দিচ্ছি বটে, তবু সত্যি কথা স্বীকার করছি অনেকদিন পরে একটা জ্যান্ত পৃথিবীর মানুষ দেখে ভারী ভালো লাগছে। কিন্তু গৌতমবাবু, আপনি হেরে গেলেন। আমি আপনাকে দেখেই চিনতে পেরেছি। অথচ আপনি এতক্ষণেও—

গৌতম আর একবার তাকাল, এতক্ষণে হাতুড়িটা নামিয়ে রাখল। স্মৃতির ঘরের দরজাটা খুলে পড়েছে।

বলল জ্যান্ত মানুষকে চিনতে আর অসুবিধে কি ? কঙ্কাল থেকে চেনাই শক্ত। এতক্ষণ একখানা কঙ্কালের মধ্যে থেকে টুনু বৌদিকে আবিষ্কার করতে চেষ্টা করছিলাম। আসানসোলের টুনু বৌদি।

তার মানে আবিষ্কার হয়ে গেল ?

ধ্বংসস্তূপ থেকে মোহেঞ্জোদড়ো আবিষ্কারের মতোই।

জানা গেল নাম। টুনু।

ধামটাও জানা গেল, আসানসোল। যদিও সেটা অতীতের।···কিন্তু এখানে

কেন ? কোথা থেকে যেন ফেরার পথে শ্রান্তক্লান্ত গৌতমকে দেড়দিনের জন্যে আশ্রয় নিতে হয়েছিল চিত্তর মামাতো না পিসতুতো দাদা আসান-সোলের মল্লিক সাহেবের বাড়ি। মল্লিক সাহেব ছিলেন না বোধহয় ট্যুরে গিয়েছিলেন, কিন্তু মেমসাহেবের আতিথ্যে সে অভাব মাথা তুলতে পারে নি।

আতিথ্য, ঔজ্জ্বল্য, উচ্ছলতা প্রাণের দীপ্তি। সবটা মিলিয়ে মনে ছাপ রাখবার মতো। যদিও বারবার বলেছিল, যা পারলাম যত্ন আত্তির চেষ্টা করলাম বাপু তবু ঠিক জানি তোমার দাদা এসেই জিগ্যেসবাদ করে করে একশো খুঁৎ বার করবেন। 'এটা করলে ভালো করতে, ওটা করলে হতো, কখনো আসে না চিত্ত,' এই সব।

গৌতম অবাক হয়েছিল, এতর পরেও ?

এই রকমই তো মনে হচ্ছে। চিত্ত তোমার কি মনে হয় ? দাদাটিকে তো জানো ?

চিত্ত বলেছিল, হ্যাঁ, বরাবরই সতুদা একটু খুঁৎ খুঁতে। তবে তোমার ব্যাপারে নয় বোধহয় টুনু বৌদি। পিসিমার মতে তো 'ছেলেটা একেবারে বৌয়ের পায়ে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে।'

সে তো সব মায়েদেরই সব ছেলেদের সম্পর্কে বদ্ধমূল ধারণা থাকে।

হেসেছিল টুনু।

ভুরুর উপরকার তিলটা, আর দুই ভুরুর মধ্যেকার টিপটা ঝলসে উঠেছিল।

বৌদিকে তুই এমন হেলাফেলার ডাক নামে ডাকছিস যে চিত্ত ?

তা' কি করবো ? বয়েসে ছোট একটা মেয়েকে কত মান্য করা যায় ?

শুধু টুনি বলি নি এই ঢের।

কিন্তু এখন যেন শুধু 'টুনি' বলল।

তাই মনে হলো যেন।

বলে উঠল, এটার কিন্তু দারুণ তেষ্টা পেয়েছিল টুনু। ধমক দিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা করে নিয়ে এসেছি।

তবে ? 'বৌদি' শব্দটা বাতিল হয়ে গেল কেন ? ইঞ্জিনীয়ার মল্লিক সাহেবের

স্ত্রীর এমন অবস্থা কেন ?···

তবে কি পৃথিবীর সেই কুটিলতম ঘটনা? যা চিরদিন মানুষের সমাজ সংসারকে জটিলতম করে তোলে! চিত্ত এত নীচ হবে ? অথচ আর কীই বা সম্ভব সে তো ভেবে পাওয়া যাচ্ছে না।

টুনু বলল, ভালই করেছ। ঠাণ্ডা করে ফেলবার ওর থেকে উপযুক্ত দাওয়াই আর কী আছে ? কিন্তু জলটা তো দরকার ! পঞ্চুকে ডাক একটু।

চিত্ত ডাকল ও বাপ পঞ্চু।

কোথায় যেন একটানা একটা 'ঠুক ঠুক' শব্দ হচ্ছিল, সেটা থেমে গেল।

পঞ্চু এসে দাঁড়াল ঘরের সামনে।

টুনু বলল এক গেলাশ জল এনে দিতে পারিস পঞ্চু ? ভালো গেলাশে।

পঞ্চু তাকিয়ে দেখল।

বুঝল জল দরকার ওই নতুন বাবুটার জন্যে। এবং এও বুঝল, এর জন্যে এখন কিছুটা খাটতে হবে তাকে। তা হোকগে। বাবুটাকে তার খারাপ লাগছে না। দেখতে বেশ চেকনাই আছে। রংটাও গোরা গোরা। থাকবে না চলে যাবে কে জানে। থাকলে ভালো হয়।

আসলে পঞ্চুরও বোধহয় একটা 'জ্যান্ত জগতের' মানুষ দেখে ভালো লেগে গেছে! টুনুর কথার উত্তরে পঞ্চু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'এনে দিতে পারিস পঞ্চু ?' একথার মানে? 'এনে দে' বলতি জানো না? লোকের সামনে মান-এজ্জোত নাই ?

বলেই ফড়িঙের মতো ফস করে চলে গেল, এবং প্রায় মুহূর্তে একটা আশ্চর্য জিনিস নিয়ে এলো। একটা পরিষ্কার কাঁচের গ্লাশে একগ্লাশ পরিষ্কারই জল। তা এই পরিবেশে আশ্চর্যই বলতে হবে বৈ কি।···গৌতম তো মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছিল একটা চটা ওঠা কলাইকরা অথবা কলঙ্কপড়া পেতলের গ্লাশে পুকুরের ঘোলা ঘোলা জল আসছে।

গেলাশটা হাতে নিয়ে গৌতমের মুখের রেখায় যে অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো, সেটা হচ্ছে আনন্দ মিশ্রিত বিস্ময় অথবা "বিস্ময়" মিশ্রিত আনন্দ।

জলটা ঢকঢক করে শেষ করে ফেলে গৌতম গেলাশটাকে পঞ্চুর হাতে

ফেরত দিয়ে বলল, এ জল কোথাকার রে ?

পঞ্চু গম্ভীর ভাবে বলল, তেঙ্গুটির ডাকতারবাবুর বাড়ির এদারার।

ওঃ। তা' অতদূর থেকে আসে কি করে ?

পঞ্চু গম্ভীরতর হয়ে বলল, পায়ে হেঁটে আসে না, আনে কেউ।

ও বাবা ! এ যে কাঁচের গ্লাশের পরিষ্কার জলের থেকেও অপ্রত্যাশিত।

গৌতম নীচুগলায় বলল, কী-রে চিত্ত, ব্যাপার কী ? কাদের ছেলে ?

চিত্তও হেসে নীচুগলায় বলল, মজার ব্যাপার ! ও কোনো কারণেই আমি শব্দটা উচ্চারণ করে না। চেনা কেউ হলে হয়তো বলতো, হতভাগা পঞ্চু থাকতে আবার কে আনতে যাবে !···তুই অচেনা বলেই—

গৌতম বলল, এখানে এই গেলাশটা কিন্তু প্রায় অপ্রত্যাশিত।

টুনু বলল, ঠিক বলেছেন। ভাঙাফুটো মাটির ভাঁড় হলেই যেন খাপ খেত, তাই না ? কিন্তু মুশকিল এই এতদিনেও এই বাবুয়ানাটুকু ছাড়তে পারা যাচ্ছে না। এই লোকটার ঘাড় ধরে করিয়ে নিতে হচ্ছে। ছেলেবেলা থেকেই এই একটা রোগ আমার--কাঁচের গেলাশ ছাড়া জল মুখে তুলতে পারি না।···

একটু হাসল টুনু বলল, মানুষ কী অদ্ভুত জীব দেখুন ? জীবনটা হারিয়ে ফেলেও, কখনো কখনো তুচ্ছ এক একটা অভ্যাস ছাড়তে পারে না।

গৌতম এমন বোকা নয় যে ফস করে বলে বসবে, তা জীবনটা হারিয়ে গেল কোনো ঝড়ের ধাক্কায় ? অথবা বলবে, আপনাকে এ পরিবেশে দেখবো, দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না কোনোদিন। শুধু বলল, চিত্ত তো আমায় পানাপুকুর দেখিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

পঞ্চু চলে যাচ্ছিল, চিত্ত বলল, সেই থেকে কী ঠুকছিস রে পঞ্চু ?

ঠুকবো আবার কী ! ডুমুর ছেঁচতেচি।

ডুমুর ছেঁচতেচিস ? কী হবে ?

টুনু হেসে ফেলে বলল, জানো না ? ডুমুরের রস খেলে গায়ে 'অক্ত' হয়।

'অক্ত' কথাটা যে পঞ্চুর মুখের এবং এটা যে ঠাট্টা, তা বুঝতে অসুবিধে

হয় না পঞ্চুর। বিরক্ত স্বরে বলে ওঠে, তামাসা করে তো আর কোবরেজের কতা উড়িয়ে দিতে পার না দিদি! কোবরেজ মোশাইকে শুদিয়েই একাজ করচে পঞ্চা।

চিত্ত বলল, দাঁড়া দাঁড়া! তেঙ্গুটির সেই ঘাড়নাড়া বুড়ো কবরেজটা না?

বুড়ো হলেই ঘাড় নড়ে দাদাবাবু! তোমারও নড়বে। তা'বলে অছেদ্দার কিছু নেই।

আরে বাবা অছেদ্দা করছি না। তা'সে না থোড়ের রসের কথা বলেছিল। ইয়া ইয়া এক একখানা থোড় এনে রস খাওয়াচ্ছিলি দেখেছি। তার কী হলো।

কি হলো উগীকেই জিগ্যেস করো।

পঞ্চুর কণ্ঠে ক্রোধের উত্তাপ।

টুনু বলল, আর বোলো না। রোজ রোজ সেই তেঙ্গুটিতে গিয়ে—থোড় এনে এনে—

তেঙ্গুটিতে পঞ্চা শুদু থোড় আনতি যায় না, জল আনতি যায়।

আহা তা তো যাস। কিন্তু রোজ রোজ যে বাসের স্টপে গিয়ে ব্যাপারীদের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে একখানা করে থোড় নিয়ে আসতিস সেটা কেমন? ওদের লোকসান না?···বলল টুনু।

পঞ্চু ক্ষুব্ধগলায় বলল, ওদের ওই ঝোড়া ঝোড়া মালের মদ্যে থেকে অ্যাতো-টুকুন একখানা নিলিই অমনি ওরা ভিকিরি হয়ে যাবে?

ওরা যাবে না। আমরা হবো। চাওয়া মানেই তো ভিক্ষেরে! ভিক্ষের জিনিসে কি গায়ে রক্ত হয় রে? বরং রক্ত শুকিয়ে যায়।

পঞ্চু বেজারগলায় বলল, তা' বেশ তো আর তো ভিক্কের মাল চালানো হচ্ছে না। জঙ্গল থেকে জঙ্গলে ডুমুর নে আসা হচ্ছে।

গৌতম শিউরে উঠে বলল, কী কাণ্ড! বুনো ডুমুর! ওসব জিনিস বিষাক্ত কিনা ঠিক কী?

পঞ্চু অবজ্ঞাভরে বলল, পঞ্চু পাগল না, তাই না বুজেসুজে বিষ এনে খাওয়াবে। ···কবরেজকে দেইকে আনা হয়েছে।

রাগরাগ করে চলে গেল।

আবার সেই ঠুক ঠুক শব্দ উঠলো।

গৌতম বলল, জঙ্গলের বুনো ডুমুর, শুনেই তো মাথা ঘুরছে! জীবনে তো শুনি নি। চিত্ত-রে—কার প্রেসকৃপশন! সে কেমন কবরেজ বাবু। দেখেছিস তাকে?

হবে কোথাকার কোন্ হাতুড়ে ফাতুড়ে। তা' হয় নি তো কিছু! খাওয়া মাত্রই মৃত্যু না হলেও, ক্রমশ ক্ষতি করে—এমনও তো হতে পারে।

টুনু বলল, বিষও কখনও কখনও অমৃত হয়ে ওঠে, এমনও হয় গৌতমবাবু। ভগবানের কাছে ওর ওই বিশ্বাসের যদি কোনো মূল্য না থাকে, তাহলে বুঝবো কোনো কিছুরই মূল্য নেই তাঁর কাছে।

চিত্ত হেসে উঠলো, বোঝ গৌতম! ওই ডুমুরের রসে টুনুর 'অক্ত' হওয়া ঠেকায় কে!

জীবনের একটা দিন নাওয়া খাওয়া শোওয়ার অসুবিধে ঘটলেও যে খুব একটা কিছু এসে যায় না তার প্রমাণ পেল গৌতম। আর পেয়ে নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল।

পঞ্চুর সহযোগিতায় কাঠের উনুন জেলে চিত্ত চালডাল নুন আর আলু সহযোগে যে একটা ঘ্যাঁট্ বানিয়েছিল দুপুরে, সে তো বেশ নেমেও গেল গলা দিয়ে।

এখন বিকেল পড়ে এসেছে।

আবার সেই নেশালাগানো বৈশাখী হাওয়া এলোমেলো খেলে বেড়াচ্ছে। এখন যে স্নিগ্ধ এখন মনোরম!

চল একটু ঘুরে আসি—

বলে গৌতমকে নিয়ে বেরিয়েছে চিত্ত।

'রাস্তা' বলে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব নেই অবশ্য। শুধু মাঠ ভেঙে চলা। শুকনো মাঠ, মাঝে মাঝেই কিছু কাঁটাঝোপ। আসলে হয়তো এরা সবাই কাঁটা গাছ নয়, শুধু বর্ষার সময় যেখানে-সেখানে যেসব আগাছা জন্মায়,

তারাই চৈত্রের রোদে শুকিয়ে ঝুনো হয়ে উঠে কাঁটা গাছের ভূমিকা নিয়েছে। চলতে চলতে গায়ে ঠেকলে গা ছড়ে। জামা কাপড় আটকে গেলে খোঁচা খেয়ে ছেঁড়ে।

তবু গ্রামের পড়ন্তবেলার যে একটা চিরন্তন সৌন্দর্য আছে তা যেন একটা অনাস্বাদিত স্বাদ বয়ে আনছে গৌতমের কাছে।···জীবন অতিবাহিত হয় ভয়াবহ লোকারণ্যের মধ্যে। সর্বত্র ঠেলাঠেলি ছুটোছুটি ধাক্কাধাক্কি কে আগে এগোবে তার প্রতিযোগিতা। এমনি পড়ন্ত বেলায় অফিসপাড়ায় রাস্তাগুলো শুধু লোকে লোকেই যেন নারকীয়। কত রকমের লোক, সারা পৃথিবীর কিছু কিছু নমুনা যেন একজায়গায় ছেড়ে দিয়ে 'কুলপি' বরফের মতো ঝাঁকিয়ে চলা হয়ে চলেছে।

সেই জনাকীর্ণ কলকাতার মানুষের চোখে এমন অদ্ভুত লোক বিরলতা যেন একটা আশ্চর্য অনিয়মের মতো।

লোক বিরল। শুধু দূরে দূরে কিছু লোককে দেখা যাচ্ছে।···গ্রাম্য পটভূমির চিরন্তন 'দিনান্তের দৃশ্য।' যা শত-সহস্রবার পটুয়ার পটে আঁকা হয়েছে, হয়তো চিরকাল ধরেই হবে। ছবি আঁকতে শিখলেই আঁকিয়ে কখনো একবার তার রং তুলি নিয়ে এই চিরন্তন ছবিটা কাগজে ক্যানভাসে ধরে রাখতে চেষ্টা করবে।

নিতান্তই লজ্জা নিবারণার্থে স্বল্পমাত্র একটু ন্যাকড়া পরা কালো কালো শীর্ণ শীর্ণ চেহারার কিছু মানুষ লাঙলের ফলাখানা কাঁধে নিয়ে চলেছে একটি একটি করে।···সঙ্গে হালের বলদরা। গলায় ঘন্টি, তার থেকে একটানা একটা ঠুং ঠুং শব্দ উঠছে।···দু-একটা রাখালছেলে দু-চারটে শীর্ণ গরুকে ঠেঙিয়ে নিয়ে চলেছে মুখে একটা অদ্ভুত হেট্ হেট্ শব্দ করতে করতে। ওদের প্রপিতামহের পূর্বপুরুষরাও হয়তো ঠিক এই একই শব্দ তুলে গরুদের গোয়ালে ফিরিয়ে নিয়ে যেত।

চলতে চলতে গৌতম বলল এক-একটা জায়গায় হাজার-হাজার বছরের পৃথিবী যেন ফ্রীজ্ হয়ে বসে আছে, কী বলিস?

চিত্ত বলল, আছে, এবং শেষ পর্যন্ত ওরাই থাকবে।·· সায়েন্স অনেক লাফা-

লাফি করবে। অনেক ঝড় তুলবে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল হাতের মুঠোয় পুরে ফেলেছি ভেবে প্রলয়নাচন নাচবে, আর শেষ পর্যন্ত সেই প্রলয়ের আগুনে ধ্বংস হয়ে যাবে।···থাকবে লাঙলের ফলা, কুমোরের চাক, গরুরগাড়ির চাকা আর কাঠের আগুন।···এখনি তার নমুনা শুরু হয়ে গেছে।...তেল কয়লা বিদ্যুৎ যারা নাকি বিজ্ঞানের হাতিয়ার, তারা তো ক্রমশ জবাব দিতে চাইছে। মড়ারা বিদ্যুৎ চুল্লীতে পুড়তে শিখেও, ফের আবার পুরনো নিয়মে কাঠের আগুনে দগ্ধাতে যাচ্ছে।

গৌতম ওর তুলনা শুনে হেসে ফেলল।

বললো, তা তুই বুঝি সব পরিণাম বুঝে ফেলে এই আদি ও অকৃত্রিমের মধ্যে বাস করতে এসেছিস?

চিত্ত বলল, তা অবশ্য নয়।

তারপর একটু থেমে বলল, টুনু বৌদির হিস্ট্রি তো তোকে বলা হয় নি।

গৌতম বলল তুই তো দেখছিলাম এখন 'বৌদি' কথাটাকে বাহুল্য বলে বাদ দিয়েছিস।

ওটা টুনুরই নির্দেশ। বলেছে, ওই বৌদি ডাকটা যেন ছেঁড়া ফুল খোঁপায় তোলার মতো লাগে চিত্ত, ওটাকে বাদ দাও। শুধু টুনু বললেই সাড়া দেবো।

কিন্তু তোর সেই দাদা? অর্থাৎ তোর রাইভ্যাল। সে তোকে—

গাধার মতো কথা বলিসনে গৌতম! তুইও তো তাহলে আমার আত্মীয় সমাজের মতো।···তা বলবো কি, অন্য লোক দূরের কথা, আমার নিজের মা-বাপই তো ভেবে ঠিক করে রেখেছে চিত্ত তার সতুদার বৌকে ভাগিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে।···ঘটনাকে সেই কালারেই দিয়ে রেখেছে রাস্কেল সতুদাটা। আত্মীয়জনেরা আর আমার মুখ দেখে না জানিস বোধহয়।

জানতাম না, এইমাত্র জানলাম। নিরুদ্দেশ পুত্রের খোঁজ করে বেড়াচ্ছেন তাই জানি।

মানুষ কত কম জানে। ভুল জানতে জানতেই মনের মধ্যে শ্যাওলা ধরে চলে, ছ্যাৎলা জমে ওঠে। টুনু বৌদি আর সতুদার ঘটনা যদি শুনিস! স্রেফ

একটা হিন্দী ছবির প্লট।

থেমে গেল চিত্ত।

গৌতম বলল, একটা কোনো গোলমেলে ব্যাপার রয়েছে তা তো বুঝছি। সবটা খুলে বলতে যদি আপত্তি থাকে, একটুখানি বলতে আসিসনে বাবা। মাথা ধরে যায়।

চিত্ত বলল, আপত্তি মোটেই নেই। আসলে খুলে বলবো বলেই তোকে হঠাৎ হরণ করে নিয়ে এলাম। তোকে আমার দরকার।

তারপর বলল খুলে।

সত্যিই কাঁচা হিন্দী ছবিব প্লটের মতোই।

সতু মল্লিক নিজে গাড়ি চালিয়ে বৌ নিয়ে বর্ধমানে এসেছিল বোনের ছেলের অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্নে, ফিরতে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা।···জনবিরল রাস্তা, বেশ স্পীড বাড়িয়েই চলছিল, হঠাৎ পথে পড়ে থাকা একটা পাথুরের চাঁইতে হোঁচট খেয়ে গাড়ি ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে গেল।

আশ্চর্য তো! এই পথ দিয়েই সকালে গেছে। কালো চকচকে মসৃণ পথ কোথাও কোনো ঠেক খায় নি, এটা কখন কোথা থেকে?

গাড়ির দরজা খুলে নেমে এসে দেখছে, হঠাৎ কোথা থেকে যেন মাটি ফুঁড়ে সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল একটা লোক! হাতে একখানা চকচকে জিনিস। সেটাকে অবলীলায় লোফালুফি করতে করতে গাড়ির দরজা চেপে ধরে যা বলল সে তার অর্থ হচ্ছে, তার একখানা গাড়ির খুব দরকার, ভীষণ জরুরি দরকার। অতএব সাহেব যেন দয়া করে গাড়িটা তাকে উপহার দিয়ে নিজের ব্যবস্থা করে নেন।···হাঁটা দিন না। হাঁটা দিন! ঠিক পৌঁছে যাবেন বাড়ি।···না, না মেমসাহেবের নেমে আসার দরকার নেই, উনি থাকুন। ওনার কোমল শরীর হাঁটতে পারবেন কি করে? উনাকে সময়মতো বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হবে। হ্যাঁ সাহেবের বাড়ি সে চেনে বৈ কি! সাহেবকে আর এখানের কোন্ শালা না চেনে! বাড়িও চেনে।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, তবু চিনতে পেরেছিলেন মল্লিক সাহেব, অফিসের সেই পিয়নটা। কিছুদিন আগে ঔদ্ধত্য আর অবাধ্যতার অপরাধে ক্ষেপে

গিয়ে যার চাকরি খেয়েছিলেন সতু মল্লিক।···ওর হাতের অস্ত্রটা যত চকচক করছে, তার থেকে বুঝি বেশী চকচক করছে চোখ জোড়াটা।

মল্লিক সাহেব মিনতি করে বললেন, তাঁর কাছে যা কিছু আছে, টাকা-পয়সা ঘড়ি, মেমসাহেবের গায়ের গয়না এবং গাড়ি সব নিয়ে চলে যাক শুধু মেমসাহেবকে নামতে দিক।···লোকটা জিভ কেটে হাঁহাঁ করে উঠলো, ছি ছি। মেমসাহেবকে কখনো নামতে দেওয়া যায়? গরীব বলে কি তার শরীরে মায়া দয়া নেই? ওঁকে হাঁটাবে? মেমসাহেবকে তারা ঠিকই সময়-সুবিধেমতো গাড়ি চাপিয়ে পৌঁছে দেবে। সাহেব, বেশী বাকতাল্লা মারতে আসবেন না কেটে পড়ুন।···

বলেই এক ধাক্কায় সাহেবকে ঠেলে ফেলে দিয়ে গাড়িতে চড়ে বসেছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই স্টার্ট দিয়েছিল।

কিন্তু মেমসাহেব?

তিনি কি বোবা কালা অন্ধ না বুদ্ধু?

তিনি নেমে পড়লেন না? চেঁচালেন না? প্রতিরোধ করলেন না? ঝাঁপিয়ে গাড়ি থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলেন না? গাড়ির তো আরো একটা দরজা ছিল?

তা ছিল?

কিন্তু সেদিকেও যে-কোনো ফাঁকে আরো একটা লোক মাটি ফুঁড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল, আর দরজা চেপে একই ভঙ্গিতে ছোরা নিয়ে লোফালুফি করছিল।

তবু মেমসাহেব ছুরির মুখের সামনে দিয়েই ঠেলে নামতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু লোকটা দাঁত বার করে হেসে জানিয়েছিল, কেন মিথ্যে 'বুড়বাকি' করছেন মেমসাহেব? কাউকেই খতম করবার ইচ্ছে তাদের নেই। শুধু মেমসাহেবকে দুদিন তাদের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে যেতে চায়, আর সাহেবের গাড়িখানা উপহার পেতে চায়।···তবে এতে বাধা দিতে এলে সাহেবকে খতম করা ছাড়া উপায় নেই। বুঝে দেখুন তাঁর হাজব্যাণ্ডের প্রাণ তাঁর হাতে। বেশী চেল্লাচিল্লি করতে গেলেই সাহেবের পেটে ঠেকিয়ে রাখা ছুরিটা

পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবে।

অতঃপর গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার মুখে সে লোকটাও গাড়িতে উঠে পড়ে। এবং মরীয়া মেমসাহেব যখন পিছনের সীট থেকে দু'হাত দিয়ে গাড়ি চালকের গলাটা টিপে ধরতে চেষ্টা করেছিলেন, দ্বিতীয় লোকটা মেমসাহেবকে কায়দা করে ফেলে হাতমুখ বেঁধে ফেলেছিল তাঁরই পরনের শাড়িটা ছাড়িয়ে নিয়ে।

স্তম্ভিত গৌতম রুদ্ধশ্বাসে বলল, তারপর ?

তারপর ?

তারপর তারা তাদের কথা রেখেছিল, সত্যিই দিন চার-পাঁচ পরে একদিন বেশী রাতে প্রায় মৃতকল্প অবস্থায় সাহেবের দরজায় নামিয়ে রেখে গিয়েছিল। কি ভাগ্যি চোখে পড়েছিল শুধু সাহেবেরই।···কারণ বিনিদ্র তিনি, একটা যেন গাড়ির শব্দ পেয়েছিলেন।

সাহেব সেই মর্মান্তিক সন্ধ্যায় কোনোমতে বাড়ি ফিরে এসে লোকজনকে জানিয়েছিলেন মেমসাহেব বর্ধমানেই রয়ে গেলেন—শরীর খারাপ হয়েছে। অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা।

ননদের বাড়ি নেমন্তন্ন গিয়ে দু'দিন থাকাটা এত বেশী স্বাভাবিক যে, ও-নিয়ে প্রশ্নই উঠতে পারে না। আর শরীর খারাপ ? সেটাও স্বাভাবিক, রোদ্দুরে গরমে এতটা পথ গাড়িতে গিয়ে—

দু-তিনটে দিন বোকার মতো বোবা হয়ে বসে থেকেছে সতু মল্লিক শুধু কলঙ্ক প্রচারের ভয়ে। না দিয়েছে পুলিশে খবর, না বলেছে আত্মীয়জনকে।··· তিনদিন পরে কী ভেবে, চিত্তকে খবর দিয়েছিল, 'ভীষণ বিপদ শিগ্রি চলে আয়।

চিত্ত যেদিন এসে পৌঁছেছে সেই রাতেই টুনুকে পৌঁছে দিয়ে গেল ওরা।

চিত্ত বলল, 'একে তো হসপিটালে নিয়ে যেতে হয়—'

সতু বলল, এখানে তো অফিসের ডাক্তার, অফিসের হসপিটাল, জানাজানির কিছু বাকি থাকবে না, তুই ওকে অন্য কোথাও নিয়ে গিয়ে যা হয় কর।

কলকাতায় ?

না না, সেখানে তো সমস্ত আত্মীয় সমাজ।

বর্ধমানে ? কমলাদির বাড়ি ?

তার মানে চিত্ততোষেরও পিসতুতো দিদির বাড়ি।

ওরে সর্বনাশ !

তবে ?

জানি না, তুই একটা উপায় বার কর ভাই।

অবশ্য সেই 'উপায়'টা সতুদাই মাথা থেকে বার করল। কোনো মফস্বল জায়গায় নিয়ে গিয়ে নামহীন কোনো হাসপাতালে ভর্তি করে দিকগে চিত্ত নিজের স্ত্রী পরিচয়ে। যাহোক একটা গল্প বানিয়ে বলুক আর নার্স ডাক্তার সকলকে মোটাসোটা কিছু দিয়ে-টিয়ে—সতু অবিবেচক নয়।

সেই 'মোটা' অঙ্কটা চিত্তর হাতে গুঁজে দিয়েছিল প্রায় জোর করেই। বেশী জোর করার দরকার হয় নি অবশ্য, চিত্ত তো খোকা নয়। টাকা ব্যতীত যে কিছুই হয় না, এবং টাকার গুণে যে সবই হয় এটা তার অজানাও নয়।

এসব পরামর্শ হয়েছিল টুনুর আড়ালেই, তবু টুনুকে যখন বোঝাতে চেষ্টা করা হলো, এখানের কলকোলাহল অসুবিধেজনক, মল্লিক সাহেবের স্ত্রী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে রয়েছেন জানলে লোকে দেখতে গিয়ে গিয়ে অস্থির করে তুলবে, এবং কী অসুখ. কী ট্রিটমেন্ট হচ্ছে, কোন্ ডাক্তার দেখছে, ইত্যাদি প্রশ্নে প্রশ্নে জর্জরিত করে তুলবে। অতএব কোনো একটা শান্ত জায়গায় নিয়ে গিয়ে—যেখানে সম্পূর্ণ বিশ্রাম পাওয়া যাবে, ভর্তি করে দেওয়া—

তখন টুনু বিক্ষতমুখে অদ্ভুত একটা হাসি হেসে বলেছিল, সবই বুঝতে পারছি। ঠিকই বলছ। তবে একেবারে সম্পূর্ণ বিশ্রামের মতো কিছু ওষুধ যোগাড় করে ফেল না দুই ভাই মিলে, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

কিন্তু সেকথা তো সত্যি শোনা যায় না।

অতএব ওই সহজ সমাধানটা করা গেল না। সতু মল্লিকের পরিকল্পনা মতোই কাজ হলো। 'বুদবুদ' গ্রামের একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে চিত্ত নিজের স্ত্রী পরিচয় দিয়ে—টাকার বল তো ছিলই সঙ্গে।

আশ্চর্য! অমন একটা আজেবাজে জায়গাতেও, মহামহিমান্বিতা মল্লিক মেমসাহেব দিব্যি সেরে উঠলেন। এবং বেশ তাড়াতাড়িই উঠলেন।

চিত্ত জানাল, সেরে উঠেছে বৌদি, গাড়ি পাঠাও সতুদা।···আবার যথারীতি রানীর মতো গিয়ে নিজের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হোক বেচারী। অনেক ঝড় খেয়েছে অনেক কষ্ট পেয়েছে।....এও জানাল সতুদার বুদ্ধিটা মন্দ হয় নি, এখানে কোনো সত্য রেকর্ড থাকল না, ছদ্মনামে ছদ্ম পরিচয়ে দিব্যি চালিয়ে দেওয়া গেছে!

এদিকে সাহেবের বাড়ির লোকেরা জানে, মেমসাহেবের অসুস্থ হয়ে বর্ধমান থেকে ফেরায় সাহেবের ভাই তাঁকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেছেন বড় ডাক্তার দেখাতে।

কলকাতায় বড় ডাক্তার দেখাতে যাওয়াটা এতই সাধারণ ব্যাপার, ও নিয়ে কোনো সন্দেহের প্রশ্নই ওঠে না। সাহেব গেলেন না? তাতে কি? ওখানে সাহেবের 'বাড়ি' নয়? সে বাড়িতে তাঁর মা নেই? দাদা নেই? তাছাড়া —মেমসাহেবেরও মা বাপ নাথাক একটা বাপের বাড়ি তো আছে। যেখানে ভাই-টাই আছে।

অতএব সব দিক ঠিক ঠাক।

টুনু মল্লিক আবার স্বস্থানে এসে প্রতিষ্ঠিত হোক।

কিন্তু সতু মল্লিক গাড়ি পাঠালেন না!

পাঠালেন একখানা চিঠি।

যে চিঠির সারমর্ম হচ্ছে—ইতরজনভুক্ত ধর্ষিতা স্ত্রীকে নিয়ে আর আগের মতো আনন্দে ঘর করা এস. মল্লিকের পক্ষে সম্ভব নয়। সবসময় মনের মধ্যে লেগে থাকবে একটা অশুচি ভাব। যার ধর্ম নষ্ট হয়ে গেছে, পবিত্রতা নষ্ট হয়ে গেছে ভবিষ্যতে তার সন্তানসন্ততি দিয়ে এই পুণ্যময় সম্ভ্রান্ত বংশের ধারা রক্ষা করাও তো সঙ্গত নয়।

অতএব ওকে কোনো হোমে বা আশ্রমে ভর্তি করে দেবার ব্যবস্থা করুক চিত্ত। চিত্ত তো শুধু তার মামাতো ভাই মাত্র নয়, তার বন্ধু হিতৈষী বিপদত্রাতা। এতটাই যখন করল, বাকিটুকুও করুক। টাকার জন্যে ভাবনা

নেই, সে বিষয়ে সতু অবিবেচক হবে না।···সবশেষে লিখেছে—তাছাড়া যতই সাবধান হই, খবর বাতাসে রটবেই। সেই পাজী পিয়নটা না কি বাহাদুরী করে কোথায় কার কাছে কীসব গল্প করেছে।···অবশ্য লোকটা আর এখানে থাকে না। শোনা যাচ্ছে মোটর ডাকাতির দলে যোগ দিয়েছে। নিশ্চয় ওর কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। এবং উচিত শাস্তি একদিন হবেই ওর। কিন্তু তোর সতুদার মান-সম্মানের কথাটা ভাব?

একদিকে মান-সম্মান আর রুচির প্রশ্ন অপরদিকে, স্নেহমমতা ভালবাসা। তবু 'হৃদয়কেই' দাবিয়ে রেখেছে সতু। প্রতি নিয়ত বিঘ্ন মনে ঘর করতে হলে সেই স্নেহ-মমতা কি বজায় রাখা যাবে? নাঃ, মনকে বুঝিয়ে ঠিক করেছে সতু। চিত্ত কিছু ব্যবস্থা করে ফেলুক।

ধর্ষিতা মেয়েদের জন্যে গণ্ডাগণ্ডা 'হোম' খোলা হয়েছে এখন, হচ্ছে রোজ রোজ। শান্তিতে থাকতে পারবে টুনু। ওর জন্যে তো সর্বদাই মনোকষ্টে ভুগব আমি। তবু জানব ভালো জায়গায় আছে।

তারপর এই 'হোম'। দেখলি তো!

একটু হাসল চিত্ত।

বলল, পরিশেষে সনির্বন্ধ অনুরোধ ছিল 'চিঠি'টা যেন আমি টুনুকে দেখিয়েই ছিঁড়ে ফেলি, জগতের আর কারো চোখে না পড়ে। চিত্ত অনুরোধ রাখবে এ বিশ্বাস আছে তার সতুদার।

চিত্ত বাঙ্গ হাসি হাসল, কিন্তু সে বিশ্বাস আমি রাখি নি। একটা রাস্কেল স্কাউণ্ড্রেলের কাছে আবার বিশ্বাসের মূল্য।

কিন্তু টুনুকে দেখাবার মানে?

বাঃ, বুঝছিস না? ও যে কত দুঃসহ পরিস্থিতিতে পড়ে, কত নিরুপায় হয়ে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেটা টুনুর জানা দরকার নয়? তাছাড়া হতভাগ্য স্বামীর মনোবেদনা বুঝতে পেরে তার জন্যে সিম্প্যাথি ফীল্ করবে সেটাও দরকার।

গৌতম বলল, তবু ভাগ্য যে টুনুবৌদি সুইসাইড্ ফাইড করে বসেনি।

চিত্ত হাসল। বলল, সে ভয় করে ওকে একদিন শাসিয়েছিলাম, তেমন

কিছু যদি করে বসে তো—তা সে যাক টুনু শুনে হেসে বলেছিল, সুই-সাইড করব? তাতে তোমার ওই সতুদাটিকে বড় বেশী গৌরব দেওয়া হবে না কি চিত্ত? টুনুর জীবন হয়তো তুচ্ছই তবু এত তুচ্ছ নয় যে ওর দুর্ব্যবহারের শোধ নিতে সে জীবনটা খোয়াব।

এটা শুভবুদ্ধির লক্ষণ।

শুভবুদ্ধির অভাব নেই ওর। অভাব হচ্ছে স্বার্থবুদ্ধির।···কতদিন বলেছি চলো কলকাতায় পিসিমার কাছে নিয়ে যাই, ওই কাপুরুষটার মুখোস খুলে যাক, তা রাজী হয় না। কাজে কাজেই চিত্ত হেসে ওঠে, আমি বাড়ি থেকে আউট। সকলেরই ধারণা পিসতুতো দাদার বৌয়ের সঙ্গে 'আসনাই' করে আমি তাকে নিয়ে ভেগে আছি। শেষ অবধি সতুদা এই রকমই হিন্ট দিয়ে বেড়িয়েছে তো।···আমার ওপরও তো শেষ অবধি দারুণ রাগ। ওর কথামত টুনুর জন্যে হোমের ব্যবস্থা করে ফেললে সব দিক রক্ষা হতো, তা তো হলো না। গোঁয়ার চিত্ততোষ তো কারো চিত্ততোষণের ধার ধারে না। তেড়ে এসে দেখা করে বললাম, 'যাকে রক্ষা করতে পার নি তাকে ত্যাগ করার কথা মুখে আনলে কোন্ লজ্জায়? ঠিক আছে আমিই নিয়ে যাব। আশ্রম হোক আশ্রয় হোক সে ভার আমার। তবে তোমার মতো কাপুরুষের সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক থাকল না।···শুনে বুঝলি, আমায় যাচ্ছে তাই করল, বলল, বাঃ বাঃ! দিব্যি একখানা বেওয়ারিশ মাল পেয়ে বাগিয়ে নেবার তালই করছিলি তাহলে? বলল—কি জানি তলে তলে এসব চিত্তবাবুরই কারসাজি কিনা।···সাধের বৌদির ওপর মনে মনে লোভ পুষে আনাগোনা করে করে তাকেও পটিয়ে—গুণ্ডা লাগিয়ে কার্যোদ্ধার তো জগতে নতুন নয়। তাছাড়া অবিশ্বাসের কি আছে? চিত্ত হতভাগা তো চিরদিন ওই ছোটলোকদের সঙ্গেই মিশে বেড়ায়।··· বলল শ্রীমতী টুনু যদি তেমন সতীলক্ষ্মীই হতেন তো গলায় আঁচলের ফাঁস জড়িয়েও ওই কলঙ্কিত জীবনটিকে শেষ করে ফেলতে পারতেন। ঘরে ফিরে এসে কেলেঙ্কারি আর প্রবলেম বাড়াতেন না।

সেই চিঠিখানা যদি পড়তে চাস দেখাবো।

গৌতম বলল, থাক বাবা! আর সেই নোংরা লোকটার নোংরা হাতের লেখা ছুঁতে চাই না। এমনিতেই তো শুনেই মনে হচ্ছিল যেন একখানা কদর্য লেখা উপন্যাস পড়ছি। তবে শেষ চ্যাপ্টারটা হাতে পেলাম না।··· বোধহয় দপ্তরীর বাড়ি পড়ে আছে।

চিত্ত বলল, নাঃ। পড়ে আছে বোধহয় স্বয়ং লেখকেরই ড্রয়ারে। বোধহয় ভেবে ঠিক করতে পারছে না! শেষটা কী করা যায়।

গৌতম বলে ওঠে, তোর ওই অদৃশ্য লেখক কী ভাবছে সেই জানে। তবে আমার হাতে কলম থাকলে কী করতাম জানিস? তোর ওই সতুদাটিকে চাবকাতে চাবকাতে এখানে নিয়ে এসে বৌয়ের পায়ের তলায় ফেলে মাপ চাইয়ে, নাকে খৎ দিতে দিতে বৌকে মাথায় করে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াতাম। হাসিস না, আমার মনে হচ্ছে বাড়ি তো চিনি, আসানসোলে গিয়ে ওই মল্লিক সাহেবের নাকটা ঘুসিতে উড়িয়ে দিয়ে, আর ঠ্যাং দুখানা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে আসি। উঃ! এত হার্টলেস লোক হয়! এত শয়তান।

তোর এই মনে হচ্ছে? এদিকে—

চিত্ত হাসল, শুনছি না কি সাহেব আর শূন্য ঘরে কাটাতে পারছেন না বলে তাঁর মা কনে খুঁজছেন।

অ্যাঁ!

আহা চমকাবার কী আছে? পাত্রটি কি সোজা দামী? ধনেমানে কুলে শীলে প্রভাবে প্রতিষ্ঠায় জুয়েল না একখানা?···তার পাজী বৌটা মামাতো ভ্যাওরের সঙ্গে বেরিয়ে গেছে বলে, সে বেচারা সারাজীবন হাহাকার করে কাটাবে? আমারই ছোটখুড়ি তাঁর বোনের জন্যে চেষ্টা চালাচ্ছেন শুনে এলাম।

বাড়ি গিয়েছিলি?

গিয়েছিলাম। ঠিক প্রপার বাড়িটায় নয়। এদিক ওদিক আর কি। সংবাদ-দাতা আমার জামাইবাবু। সে ভদ্রলোকের মতে পৃথিবীসুদ্ধ সবাই ওই কুকথা বিশ্বাস করলেও তিনি করবেন না।

কথা বলছিল একটা মাঠের মধ্যে রুমাল পেতে বসে।

হঠাৎ খেয়াল হলো সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আর সারা পৃথিবীতে যেন জ্যোৎস্নার জোয়ার বইছে।

কী আশ্চর্য! কী অদ্ভুত সুন্দর!

গৌতমের মনে হলো একসঙ্গে এতখানি জ্যোৎস্না সে বোধহয় আগে কখনো দেখে নি।···মাঠের সব এবড়ো খেবড়ো রুক্ষতা, গাছপালার শীর্ণতা রিক্ততা, সবকিছু যেন মসৃণ মনোরম হয়ে উঠেছে।···গৌতমের জানা জগতের এত এত কাছে, এত দূরের একটা অজানা জগৎ ছিল।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই পঞ্চুকে দেখা গেল, তার ভঙ্গি ক্রুদ্ধ। বললো, তোমরা দুজনা গেছিলে কোতা? একটা ওগা মানুষ একা বসে ভাবতেছে সে চিন্তে নেই?

চিত্ত বলল, একা কেন? তুই তো ছিলি?

হ্যাঁ পেঁচো একটা মনিষ্যি, তার আবার থাকা।···তার কতা কেউ শোনে? তোমরাও বাড়ির বাইরে পা দেলে দিদিও আন্নাঘরে ঢুকে আন্না চাপালো।

সে কি অ্যাঁ? কেন তুই রুটি পাকাস নি?

করতে দেলে তো? বলল, আমি আঁদি, তুই বরোঞ্চো উটিটা বেলে দে! ···চল চল দেখি! কী মুশকিল।

আর মুশকিল। তিনি তো সব সেরে অ্যাখোন দাওয়ায় পা ঝুইলে বসে আচে তোমাদের তরে। জেয়ান গম্যি একটু রাকবে তো?

গৌতম বলল, এ তো দেখছি তোদের গার্জেন। পেলি কোথায়?

আমরা ওকে পাই নি, বলতে গেলে ওই আমাদের পেয়েছে।···ও আমাদের গার্জেন, আশ্রয়দাতা বন্ধু, বল ভরসা সব। বলব ওর কথা।

নেহাত বাচ্চা তো।

তাতে কি! সাচ্চা যে!

ওরা যখন বেড়ার দরজা ঠেলে ঢুকল, দেখল সেই ভাঙাচোরা মেটে দাওয়ার ধারে খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে টুনু। জ্যোৎস্নায় ধোওয়া একটা নিসর্গচিত্রের অংশের মতোই!···

গৌতমের মনে হলো ছেলেবেলায় দেশলাইবাক্সর ওপর ছবি দেখত, 'দুর্বাসার

অভিশাপ।' তাতে শকুন্তলার ভঙ্গিটা ঠিক এমনি। যেন জাগতিক জগতের থেকে বিচ্ছিন্ন।···অথচ একটু আগে না কি রান্না করেছে।

নাঃ, কেউ কাউকে বকাবকি করল না।

এরা দুজনেও নিঃশব্দে এসে বসে পড়ল সেই ধুলোয় গড়া দাওয়ার ধারে।

কারুর মুখেই কোনো কথা নেই, যেন একটা নিঃশব্দতার মাদকতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে ওরা।

কতক্ষণ যেন পরে টুনুই আস্তে বললো, পৃথিবীর যে কত সৌন্দর্য, এখানে না এলে বোধহয় কোনোদিনই জানতে পারতাম না।

গৌতম কিছু বলল না। শুধু তাকিয়ে রইল ওর শান্ত মুখটার দিকে। জ্যোৎস্নায় যে মানুষকে এত কমনীয় দেখায় তাও বুঝি কখনো দেখে নি গৌতম।···কে ধার ধারতে যায় ওসবের? চড়া আলো, চড়া সুরে আড্ডা, এর নামই তো সন্ধ্যা!···

চিত্ত কথা বলল।

বলল, এটুকু জানতে পারবার জন্যে অনেক দামের টিকিট কাটতে হয়েছে এই যা!

টুনু বলল, এখন মনে হয় না দামটা খুব বেশী দিতে হয়েছে। জীবনেরও যে কতরকম মানে থাকতে পারে, তাই কি জানা ছিল?

রান্নাঘরের দাওয়ায় কোথায় যেন পড়ে ঘুমোচ্ছিল পঞ্চু, চোখ মুছতে মুছতে উঠে এলো। বলল, আততো পুইয়ে এলো, খাওয়া দাওয়া হবেনি?

চিত্ত বলল, হবে। দে।

টুনু উঠছিল, বলছিল আমিই না হয়—

এরা বাধা দিলো, নাঃ তোমার আজ অনেক স্ট্রেন গেছে।

টুনু হাসল ম্লান ক্ষীণ হাসি, হ্যাঁ অনেক কালিয়া-পোলাও রান্না করেছি তো।

সেটা কোনো কথা নয়, চিত্ত বলল, হয়তো সে সুযোগ পেলে স্ট্রেন কমই হতো। তবে কোথায় কলকাতা থেকে ভাবতে ভাবতে আসছিলাম যে অবস্থায় রেখে গেছি, দুই বন্ধুতে এসেই সৎকার করে ফেলব তোমার, তা

নয়। তুমিই অতিথি সৎকার করতে লাগলে।

আজ কিন্তু আমার মোটেই দুর্বল লাগছে না। গায়ে যেন বেশ জোর পাচ্ছি।

গৌতম তোর ভাগ্য।

এতক্ষণে গৌতম কথা বলল, আচ্ছা, রোজ তাহলে কে রান্নাটান্না করে? তোর ওই পঞ্চু?

না না, চিত্ত বলল, টুনুই তো করেছে এসে পর্যন্ত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে দিন দিন উইক হয়ে যাচ্ছে বললে গায়ে মাখে না, অথচ বেশ বোঝা যাচ্ছিল দারুণ এ্যানিমিক হয়ে যাচ্ছে। তারপর হঠাৎ সেদিন সেন্সলেস হয়ে গেল, ডাক্তার ফাক্তারের তো বালাই নেই, ভাগ্যের হাতে সঁপে বসে থাকা। একটু সামলালে যা থাকে কপালে—বলে পরদিনই চলে গেলাম কলকাতায়। একটা কিছু তো করতে হবে।···তাছাড়া মাঝে মাঝে না গেলেও তো চলে না। যত শর্টকাটেই চালাও, কিছু তো রসদ চাই।

তা শর্টকাটটা যে কতটা হতে পারে তাও দেখল গৌতম। সত্যিই অভিজ্ঞতা একটা।

দাওয়াতেই চাঁদের আলোয় পেতে দিলো পঞ্চু তিনখানা মানকচুর পাতা আর তার উপর সাজিয়ে দিলো কালো কালো কটাকরে রুটি, কিসের যেন ডাল একটু করে, আর পঞ্চুর সেই 'অক্ত' সঞ্চারি ডুমুরের তরকারি খানিকটা করে।···

তবে পাতের পাশের গেলাশগুলো পরিষ্কার কাচের।

টুনুও বসেছে ওদের সঙ্গে।

একটু হেসে বললো, মনে আছে গৌতমবাবু অনেকদিন আগে একদিন আপনি আমাব অতিথি হয়েছিলেন? সেবারে আপনাকে মুরগী খাওয়াতে পারি নি বলে খুব আক্ষেপ থেকে গিয়েছিল। অথচ আজ এই অদ্ভুত ডিনার খাওয়াতে একছিটেও আক্ষেপ হচ্ছে না।···তাহলেই বুঝুন জীবনের কতরকম মানে থাকে, আর সে মানে হঠাৎ টের পাওয়া যায়।

চিত্ত খেতে খেতে বেশ পরিতৃপ্ত মুখে বলল, তা এই বা কম কী? প্রায় দিনই তো আমাদের ডিনারটা সারতে হয় মুড়ি দিয়ে। রুটি এখানের

লোকের কাছে রাজকীয় খাদ্য। দুর্লভ বস্তু। 'রেশন'-এর তো কোনো বালাই নেই। কত কম উপকরণে যে এরা জীবন চালিয়ে যায়। দেখে দেখে নিজেদের চাহিদাগুলো যেন অপরাধের বোঝা হয়ে ওঠে। তবু তেঙ্গুটিতে গিয়ে চেষ্টা করে চা চিনি, মিল্ক পাউডার ওই কৃষ্ণবর্ণ আটাফাটা যোগাড় করে করে আনি। মুড়ি খেয়ে তো আর পেট ভরানো যায় না। চোয়াল ব্যথা হয়ে যায়।

পঞ্চু বলে ওঠে, তা তুমি যে বসে বসে গাল বেথা করে শুকনো মুড়ি চিবোবে। জল আচড়া দিলেই মুড়ি জব্দ।

জল ? জল দিয়ে মুড়ি ?

গৌতম হেসে ওঠে, তেলের বদলে জল ?

এখানের লোকের ওই পদ্ধতি। দু'বেলা ভাত খেতে গেলে খরচা বেশী হ্যাঙ্গামা বেশী। তাই হয় পান্তাভাত খায়, নয় মুড়ি খায়। মানে জল দিয়ে। অর্থাৎ মুড়ি পান্তা।

হো হো করে হেসে ওঠে গৌতম।

তুচ্ছ একটু কারণে, হঠাৎ যেন একটা হালকা হাওয়া বয়ে যায়।

আর গৌতম ভাবে, এখন হাসছি, কিছুদিন থাকতে হলে হয়ত ওতেই অভ্যস্ত হয়ে যাব। এই তো এই অদ্ভুত খাবারও তো খেয়ে ফেলছি।

নতুন বাবুটাকে পঞ্চুর খুব ভালো লাগছে।

এমনতর গলাখোলা হাসি এ বাড়িতে কে কবে হেসেচে ? এ তল্লাটেই কোতাও আচে না কি এমন হাসি ? কে হাসতে জানে ? আর ওই নতুন বাবুটা আসায় দিদির মুকটা যেন আলো আলো নাগতেচে।···গা তুলে কাজ করতেও তো পারলো ! মানুষটা আগের চেনা, তা বোঝা যাচ্ছে ! এতদিন পরে চেনামানুষ দেকে আল্লাদ জেগেচে।

রান্নাঘরের কোণে নিজের ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে পঞ্চু এইসব প্রশ্নে আলোড়িত হচ্ছিল ! খাবার আগে বেশ একচোট ঘুম হয়ে গেছে, তাই পঞ্চু এখন বিনিদ্র।

আমাদের দাদাবাবুটা বড্ড কাটখোট্টা। দিদির সাতে কতা কয় যেন ঢিল পাটকেল ছুঁড়তেচে। পেরাণে যে মায়াদয়া নাই তা নয়, না থাকলি কি আর পতে কুইড়ে পাওয়া একটা দুক্কী মেয়েছেলের জন্যি অ্যাতো করতেচে! তিনকুলে তো কেউ নাই, দিদির নক্কীছাড়া সোয়ামীটাও না কি ঝগড়া করে তাইড়ে দেচে, দাদাবাবুই তো নে এসে আশ্রয় দেচে।···তবে ধাত-ধরন বড় রুক্কু! কতা যেন চ্যাটাং চ্যাটাং! বলে কিনা 'কবে তুমি মরবে তার জন্যি দিন গুনতেচি।···তুমি মলে আমি হরিরনোট দেব।' এসব বলা উচিত? দিদির যাই 'অতাত' মন, তাই আগ করে না।···দয়াই যদি করতেচিস তো মুকে দুটো মিষ্টি কতা কইতে কী হয়?

কী যে হয়, সেটা আর এই, অবোধ গ্রাম্যছেলেটা কী বুঝবে? কী করে ধরতে পারবে চিত্ততোষ নামের লোকটার ওইটাই আত্মরক্ষার হাতিয়ার। অসতর্ক যদি ওই হাতিয়ারটা হাত থেকে নামিয়ে বসে কে ওকে রক্ষা করবে?

ভাবতে ভাবতে নিজের কথায় এসে যেন হারিয়ে যায় পঞ্চু!···তারও তিনকুলে কেউ নেই, কখনো ছিল কিনা তাও জানে না। মাঝে মাঝে ভাবে পঞ্চু সে কি ভুঁইফোঁড়? অস্ফুট স্মৃতির শেষ সীমান্ত অবধি হাতড়াতে হাতড়াতে যেখানটা মনে পড়ে, পঞ্চু দেখতে পায়, চারিদিকে বিস্তর মানুষ, বিস্তর গোলমাল, মানুষ ছুটছে হাঁটছে, একে ওকে ধাক্কা দিয়ে চলে যাচ্ছে, আর একটা ছোট ছেলে তার মধ্যে বসে হাঁ হাঁ করে কাঁদছে।

ক্রমশ বুঝেছে পঞ্চু সেই ছেলেটাই সে।

তারপর কেমন করে যে সে বেঁচে রইল বড় হলো এই এক আশ্চর্য রহস্য। নিজের সম্পর্কে ব্যাখ্যা রাখে পঞ্চু আস্তার নেড়ি কুকুরগুলান যেমনভাবে বেঁচে থাকে, বড় হয়, পঞ্চুও তেমনিভাবে এত বড়টা হয়েচে। অথচ নেহাত শৈশবে কেউ ওকে আশ্রয়ও দেয় নি, নিয়মিত খেতেও দেয় নি কেউ। তবু টিঁকে গেছে। কে জানে কোথা থেকে কোথায় এসে পড়েছে ফুটবলের মতো লোকের পায়ে পায়ে। নামও ছিল না একটা।

কত বয়েস কী বৃত্তান্ত তা জানে না পঞ্চু, জানবার কথাও নয়। তবে স্পষ্ট

মনে থাকার কালে একবার পঞ্চুর ভাগ্য ফিরেছিল, পঞ্চুর নামকরণ হয়েছিল তখন।

সেই সেদিন—তেঙ্গুটির বাস স্টপেজের কাছে রোজ যেমন ঘুরতো তেমনি ঘুরছিল কিছু খাবার অথবা কিছু পাবার আশায়, হঠাৎ লাল টকটকে রঙের খেঁটে কাপড় পরা সর্বাঙ্গে ছাইমাখা একটা লোক বলে উঠলো, এই ছোঁড়া কোথায় থাকিস রে?

পঞ্চু মাথা নেড়েছিল, কোথাও না।

তাই বুঝি? মা বাপ নেই তোর?

পঞ্চু মাথা নাড়ল।

তোর আর কে আছে?

তাও না। আর কেউও নেই।

বাঃ বাঃ এই তো চাই! সবাই বুঝি মরে গেছে?

পঞ্চু এত জিজ্ঞেসবাদে রেগে গিয়ে বলল, কেউ তো ছিলই নাই, তো মরবে কি?···

অ্যাঁ! তুই তাহলে ভুঁইফোঁড়। তবে চল আমার সঙ্গে।···

'ভুঁইফোঁড়' কথাটার মানে সেই জানল পঞ্চু। যার কেউ থাকে না তাকে ওই কথাটা বলে।

পঞ্চু অবশ্য এককথায় রাজী হয় নি।

বলেছিল কেন যাব? যাব নি।

চল না বাবা! খেতে দেবো। রোজ রোজ পেটভরে খেতে দেবো।

পঞ্চু ঈষৎ নরম হয়েছিল, তোমায় দেকে আমার ভয় নাগতেচে!···

হা হা হা! ভয় কিসের রে? চল না। আমার সঙ্গে থাকবি।···তোরও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই!···

সেইখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে এই জলটুভি! পথে আসতে আসতে লোকটা বলল, রুটি বানাতে পারিস?

পঞ্চু সবেগে মাথা নেড়েছে।

গাঁজা সাজতে পারিস?

না ! উটা কি তা জানিই না।
আচ্ছা পা টিপতে পারিস ?
পঞ্চু বলেছিল, পারি নাই, শিইকে দেলে পেরে যাব।
ব্যস ! ব্যস ! জীতা রহো বেটা। চল।···নাম কি ?
নাম নাই !
অ্যাঁ ! বলিস কি ? একটা নামও নেই ? এই পেন্টুলটা কে দিয়েছে ?
বাজারের লোকে।
তারা তোকে কী বলে ডাকে ?
কী আবার বলবে ? বলে 'এই ছোঁড়া।' তুমি যা বললে ত্যাখন।
পথে পথে হাটে-বাজারে ঘুরে ঘুরে, কথা মন্দ শেখে নি তখনই পঞ্চু।
লোকটা বলল, ঠিক আছে, তোকে আমি নাম দিলাম 'বাবা পঞ্চানন।'
শিবঠাকুরের মতন মুখটা তোর। পঞ্চু বলে ডাকব।
পঞ্চু বলল, তুমিই তো শিবঠাকুরের মতন দেখতে। 'আগ' হলি তিরশূল ফুইটে মেরে ফেলবে না তো ?
লোকটা ওর মাথাটা চাপড়ে দিয়ে বলেছিল, ভয় নেই। ভয় নেই। এসব হচ্ছে ভেক্ ভেক্। বুঝলি ? ভেক্ মানে জানিস ?
না।
যাক ভালোই। তো ভেক্ করতে একটা চ্যালা থাকাও দরকার বুঝলি ? তাই তোকে পছন্দ করলাম।···
হাঁটতে হাঁটতে এই এখানে, এই বাড়িটায়।
পঞ্চু ভাবল তখন এর থেকেও ভাঙাচোরা ছিল।···সাধু বলেছিল পড়ে থাকা এই ভাঙা ঘরখানাতেই সে বাসা বেঁধেছে। ভগবানের সাধন-ভজন করবে বলে।···
তো পঞ্চু এসে তাতেই বর্তে গেল !
রাত্রে শোবার জন্যে নিশ্চিন্ত একটা আশ্রয়, দুবেলা নিশ্চিত খাদ্য, এ আবার কবে জুটেছে পঞ্চুর ?
ঘর ভাঙাচোরা থাকলেও, জিনিসপত্র কম ছিল না। এই যে রান্নাঘরের

সব জিনিস, এ তো সাধুরই।···সেই সাধুর কাছেই পঞ্চু রুটি পাকাতে শিখেছিল, পা টিপতে শিখেছিল, আরো কত কী-ই শিখেছিল। বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ঘর পরিষ্কার করা।

বেশ সুখেই ছিল পঞ্চু।

কিন্তু অভাগার ভাগ্য!

দিন-মাস বছর গুণতে জানে না, তবে কত দিন পরে যেন হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখতে পেল পঞ্চু সাধু নেই, নেই তাঁর গেরুয়া ঝোলাঝুলি, আর ত্রিশূলটি।

আর সবই পড়ে আছে।

তখন পঞ্চু ভাবে নি এই যাওয়াটা একেবারে যাওয়া। ভেবেছিল কোথায় বেড়াতে গেছে। ক্রমশ বুঝল। কদিন পরে গ্রামের কিছু লোক এসে বলল, সাধুটা ভণ্ড! ফেরারি আসামী! নিশ্চয় পুলিশ আসবে। তুই পালা।

পঞ্চু বলল, আসবে তো কি? পুলিশের ভয়ে পালাব কেন? আমি কি চোর?

কিন্তু পুলিশ এলো না।

তখন কিছু লোক বলল, সাধু ছিল সিদ্ধ পুরুষ। হিমালয়ে চলে গেছে তপস্যা করতে।

পঞ্চু মনমরা হয়ে থাকল কিছুদিন। তারপর আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যেতে লাগল। অবিশ্যি গ্রামের লোকের কিম্বা সেই বাসস্টপের বাজারের লোকেদের কারুরই পছন্দ হয় নি বেওয়ারিশ পঞ্চু হঠাৎ মুফতে এতখানি বিষয় সম্পত্তির ওয়ারিশান হয়ে গেল। এটা কারই বা পছন্দ হবার মতো কথা?

তা 'বিষয় সম্পত্তি' নয়ই বা কেন?

প্রধানত একখানা মাথা গোঁজার আশ্রয়।

বহুকালাবধি পড়ে থাকা এই কার না কার পরিত্যক্ত ভিটেখানার দিকে অবশ্য কারো কোনোদিন নজরই পড়ে নি। তার কারণ জায়গাটা একেবারে গ্রাম ছাড়ানো একটা প্রান্তে। নাম না-জানা একটা মজে যাওয়া নদীর সোঁতার ধারে। এখানে এসে কে আর মুফতে সম্পত্তি লাভ করার বাসনায়

বাস করতে বসবে ?

নজর পড়ল প্রথম সাধুর আবির্ভাবে।

তাই তো, এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ানো ওই ভস্মমাখা ত্রিশূল হাতে লোক-টাকে ওই পোড়ো ভিটেটাতেই বাস করতে দেখা যাচ্ছে। ভোরবেলা পুকুরে চান করতে যায়, এখান সেখান ফুল তোলে, হয়তো বা পুজোপাঠ করে, তারপর কাঠের ধোঁয়া উড়িয়ে বেশ পাকসাক করে মনে হয়। উঁকি ঝুঁকি মেরে দেখে দেখেছে সাধুর গৃহস্থালীটিও নজরে ধরার মতো।

বেশী নজর পড়ল কুকুর বেড়ালের সমপর্যায়ের সেই নামপরিচয়হীন ছেলেটা এখানে আশ্রয় পাওয়ায়। সাধুকে 'বাবা বাবা' করে এসে ভাব জমাবার চেষ্টা করেছিল কেউ কেউ পাত্তা পায় নি। রক্তবস্ত্র পরিহিত সাধু রক্তচক্ষে তাকিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে ভাগাতো।

অতএব স্পষ্ট নজরে এলো সাধুর তিরোভাবে।

সবাই এসে এসে ঘরে ঢুকে দেখতে লাগল সাধু কি কি ফেলে গেছে। তা সে নেহাত কম কী, হিসেব করে করে দেখল, দাওয়ার ধারে টাঙানো এক গাছা দড়ি, এবং আস্ত একখানা গেরুয়া গামছা। জলজ্যান্ত একটা বালতি, একটা টিনের মগ, রান্নাঘরে দু'দুটো চটাওঠা এনামেলের গ্লাশ, একটা পেতলের থালা, কিছু মাটির হাঁড়ি মালশা, আস্ত সুস্থ একটা কাঠের চাকি-বেলুন, আর দিব্যি নিকোনোচুকোনো একটা গর্ত খোঁড়া উনুন! এমনকি তার পাশে জ্বালানি বাবদ বেশ কিছু শুকনো ডালপালা কাঠ-কুটো। আবার চায়ের সরঞ্জাম।

তাছাড়া ঘরের মধ্যে বাঁশ বেঁধে মাচান বেঁধে তৈরী করা একটা শোবার চৌকী। এমনকি তার উপর বিছোনো একখানা শতছিদ্র কালো কম্বল।

...তার মানে হঠাৎ চলে যাবার পরিকল্পনা ছিল না সাধুর, উঠোনে মাচা বেঁধে শশাগাছ লাগানোও তার সাক্ষী।

কোনো খেয়ালে হঠাৎই চলে গেছে।

অতএব লোকটা হয় ফেরারি আসামি, নয় সাধনসিদ্ধ 'স্বামী'।

তা সে যাই হোক, এই অগাধ সম্পত্তির মালিক হয়ে বসল কিনা ওই

অথচ্ছে ছোঁড়াটা। সাধু নাকি যাকে আদর করে নাম দিয়েছিল 'পঞ্চানন'। 'পঞ্চানন !' আরো কিছু না। বড়জোর পঞ্চা, নচেত পেঁচো।

দেখে শুনে লোকে বেজার হলো, ঈর্ষাতুর হলো, কিন্তু কি জানি কি ভেবে, কেউ তোড়জোড় করে পঞ্চুকে তাড়াতেও চেষ্টা করল না। জিনিসগুলোও হাতাতে চেষ্টায় লাগল না।···হয়তো পঞ্চুর মতো তাদেরও মনে হয়েছিল লোকটার এই যাওয়া একেবারে যাওয়া নয়, হঠাৎ একদিন আবার আবির্ভূত হবে। তখন কে তার রোষানলে পড়তে যাবে ? থাকগে মরুকগে, পেঁচোই ভোগ করুক।

ওদের মনের কথা ওরা খুলে না বললেও, চালাক পঞ্চু বেশ অনেকদিন পর্যন্ত 'বাবা'র ফিরে আসার সম্ভাবনাযুক্ত কথাবার্তা চালাত।···

উঠোনটা পোসকের রাকি বাবা, নোংরা দেকলে বাবা এসে আগ্ করবে। কাটকুটো কুইড়ে রাকি বাবা, বাবা এসে আন্না করবে।···

ক্রমশ লোকের সয়ে গেল।

পঞ্চুও তার ছোট ছোট হাত ছুটোকে কাজে লাগিয়ে লাগিয়ে বড় করে তুলতে লাগল।···পুকুর থেকে মাটি এনে এনে দেয়াল লেপে, যেখানে যা পায় কুড়িয়ে এনে উঠোনে বেড়া দেয়। ওর বেড়ার গায়ে ভাঙা ক্যানেস্তারার ফুটো টিন আছে, ছেঁড়াখোঁড়া চটের টুকরো আছে, বাজার থেকে কুড়িয়ে আনা ছেঁড়া মাছুরের অংশ আছে, আবার গাছের ডালপালাও আছে।

তবে তেঙ্গুটির বাস স্টপেজে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া তো উপায় নাই ! শুধু হাঁড়িকুড়ি আর জ্বালানি থাকলেই তো পেট ভরে না ? তার ওপর অভ্যেস খারাপ হয়ে গেছে। পুরো পেট ভরাবার।

এমনি একদিন হঠাৎ পঞ্চুর অন্ধকার জীবনে সূর্যোদয় ঘটলো !···তেঙ্গুটির বাস স্টপেজে, নামল ছুটো মনিষ্যি।···হ্যাঁ সে দিনটা পঞ্চুর চোখের ওপর ভাসছে। বাবুটি একে ওকে জিগ্যেস করছে থাকবার মতো আস্তানা একটু পাওয়া যায় কি না ছু'একদিনের মতো। না ভালটাল কিছু চাই না নেহাত মাথা গোঁজবার মতো ঠাঁই। খড়েরচালা, টিনেরচালা, যা হোক।

কেউই বলছে না আছে।

আজানা অচেনা একটা 'ভদ্দরলোক', আর সঙ্গে দিব্যি সুন্দর দেখতে এক 'ভদ্দরমহিলা' এদের আবার কে আশ্রয় দিয়ে বিপাকে পড়তে যাবে বাবা। দীনদুঃখী ন্যাকড়াকানি পরা লোক হয়, তবু তাকে ভরসা করা যায়।

অতএব কেউই ওদের বিপন্ন প্রশ্নের সদুত্তর দিচ্ছে না।

পঞ্চু মন দিয়ে শুনতে শুনতে আস্তে কাছ ঘেঁষে এসে হঠাৎ বলে উঠলো, একখান ভাঙামাটির চালা আচে। তো—তোমরা হলে গে ভদ্দরলোক, থাকতি পারবে? পারলে—

চিত্ত স্বগতোক্তি করেছিল, আমরা কি আর ভদ্দরলোক আছি?

তবে এই হতশ্রীমূর্তি ছেলেটার কথায় তেমন কানও দেয় নি। অবহেলায় জিগ্যেস করেছিল, কোথায় সেই মাটির চালা বাপ?

আচে! জলটুভিতে, তো একক হাঁটতে হবে।

পঞ্চুর মনে আছে, দিদি বলে উঠেছিল, জলটুভি! নামটা কী অদ্ভুত সুন্দর! চলো সেখাইনেই যাই।

সেই আসা, সেই থাকা।

আর পঞ্চুর কৃতকৃতার্থ হয়ে যাওয়া।

দিদি বলেছিল, তুই-ই তাহলে বাড়ির মালিক? তা আমরা কিন্তু ভাড়া-টাড়া দিতে পারবো না।

বিচলিত পঞ্চু ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিল, হ্যাঁ পঞ্চুর সাতকালের বাড়ি তাই মালিক।···ভাড়ার কতা উটচে কী করতে?···তোমাদের কাচে একটু থাকতি দিলিই বত্তে যাবে পঞ্চু।

তা সত্যিই! পঞ্চুর মধ্যে সেই বত্তে যাওয়া ভাব। তবে পঞ্চু গার্জেনগিরি করতেও ছাড়ে না। জোরজোর গলায় বলে, কাঁচা ডুমুরের অস খেতে পারবে না? বললেই হলো? ওষুধ কি তোমার অসোগোল্লার অস হবে? নাকটা টিপে ধরে খেয়ে ন্যাও তো—গন্দো টের পাবে না।

কত কথা ভাবতে ভাবতে রাত শেষ হবার মুখে ঘুমিয়ে পড়েছিল পঞ্চু,

হঠাৎ ডাক শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।···দাদাবাবু বলতেছে, এই নতুন দাদাবাবু চলে যাচ্ছে-রে পঞ্চু। ঘুম থেকে উঠে দেখতে পাবি না, তাই তোরে জাগিয়ে দিলাম।···

যাঃ! চলেই যাচ্ছে! এখুনই।

হায় হায়। কিছুদিন থাকলে দিদিমণির শরীরটা ভালো হয়ে যেত।

বলল, বাজার গাড়িতে যাচ্চো বুঝি?

তাই বোধহয়।

আবার কবে আসবে?

গৌতম বলল, তা তো জানি না।

তোমার আসার কতা তুমি জানবে না তো কি ভূতে জানবে? ন্যাও দাঁড়াও একটুকু পেন্নাম করি। এসো তাড়াতাড়ি। দশদিন থাকলি ভালো হতো, দিদিমণি একটু সেরে উটতো।

ওরা বেরিয়ে এসে মাঠে পড়েছে।

এই মাঠটা থেকে বাঁক নিলেই ওই মাটির ঘরখানা আর দেখা যাবে না, চোখছাড়া হয়ে যাবে। এখন ভোরের স্নিগ্ধতা, হাঁটার কষ্ট নেই, আস্তে আস্তে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে হাঁটতে পারলে আরো ভালো লাগতো, কিন্তু দেরী করলে চলবে না, ব্যাপারীদের বাজার গাড়িটা ধরতে হবে।

চিত্ত ট্রেনে তুলে দিতে যাচ্ছে।

দুজনেই বাঁক নেবার সময় ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, দেখল একইভাবে বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে টুনু।

এই উষাভোরের আকাশ, ওই তপোবন সদৃশ একটু মাটির কুটির, বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা এক কৃশনারীমূর্তি, সবটা মিলিয়ে যেন কোনো শিল্পীর হাতে আঁকা একখানা করুণ সুন্দর ছবি।···

গৌতমের হঠাৎ মনে পড়ে গেল সেই কতদিন যেন আগে আসানসোলের মল্লিক সাহেবের বাড়ি থেকে চলে আসার সময় সাহেবের লোহার গেটের ধারেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল একখানি রমণীয় রমণীমূর্তি। সেও দেখে

ছবি ছবি লেগেছিল।···কিন্তু সে ছবি 'ছবি' হয়ে থাকে নি।···এমনি বাঁক নেবার সময় 'টাটা' করার ভঙ্গিতে হাত নেড়েছিল। আর বেশ চেঁচিয়ে বলে উঠেছিল 'আবার আসবেন।'

দুটো ছবিই না কি একই মেয়ের!

কী অবিশ্বাস্য!

ফিরে দেখা পর্যন্ত কেউ কোনো কথা বলে নি, বাঁক ঘোরার পর খানিকটা এগিয়ে চিত্ত আচমকা বলে উঠল, তুই শালা, টুনুটাকে বিয়ে করে ফেল।

গৌতম চমকে উঠল।

যেন আচমকা একটা চাবুক খেয়েছে।

চাবুকের জ্বালার প্রধান অংশটা হচ্ছে অপমানের। সেই অপমানের জ্বালাটা অনুভব করল গৌতম। ওর মনে হলো, চিত্ত বোধহয় গৌতমের টুনুর প্রতি দুর্বলতার সন্দেহে এমন একখানা রূঢ় ব্যঙ্গ করল।

গৌতম তাই প্রায় মারমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে উঠল, কী? কী বললি ছোটলোক?

কিন্তু চিত্ত এই ভঙ্গিতে পরোয়া করল না, অবলীলায় বলল, এত চমকাবার কী হলো? অন্যায় কি বলেছি?

রাস্কেল, শুয়োর! ভাবিস কি তুই? যাকে যা ইচ্ছে বলবার অধিকার তোর আছে?

চিত্ত তবুও দমল না, তেমনি সহজভাবেই বলল, মাথা গরম করছিস কেন? আসলে তো তোকে এই কথাটা বলবার জন্যেই এখানে টেনে এনেছিলাম।

গৌতম তবু ঠিক ধাতস্থ হতে পারে না, এখন ব্যঙ্গের গলায় বলে, ওঃ, তাই না কি? তাহলে বল কনে দেখাতে!

যা বলিস! হয়তো তাই। কনে দেখাতেই! কিম্বা টুনুর অবস্থা দেখাতে। তোর কি মনে হলো, এই ভাবেই ওর সারা জীবনটা চলতে দেওয়া হবে? টুনু কি খুব তুচ্ছ করার মতো একটা মেয়ে? ওর কি একটা 'জীবন' পাওয়া দরকার নয়?

গৌতম একটু গুম্ হয়ে থেকে বলে ওঠে, তা তার জন্যে আমায় কেন ?···
তুই-ই তো রয়েছিস।
চিত্তও একটু গুম্ হয়ে থেকে বলল, সেটা হবার হলে তোকে খোসামোদ করতে আসতাম না।
না হবার কি আছে ? ও তো তোর নিজের বৌদি নয়।
চিত্ত তীব্র হলো, বলেছিলাম সে কথা! বলেছিলাম, লোকে যখন অকারণই নিন্দে করে বেড়াচ্ছে, আর হতভাগা সতুদা যখন তোমায় পাকাপাকি ভাবেই ত্যাগ করে আবার বিয়ে করছে, তখন আমরা কেন আর এমন বোকার মতো একটা অদ্ভুত জীবন নিয়ে কাটাই ?···কানপুরে একটা চাকরি পাচ্ছি জানিস, বললাম চলো বিয়েটা সেরে নিয়ে চলে যাই।··· তা' হাসির তোড়ে উড়িয়ে দিলো আমায়।···বলল, 'অকারণ'টা 'সকারণ' করে তুলতে হবে বলছ ?···তোমার সতুদার কথাকে কাঁটায় কাঁটায় মিলিয়ে ফেলাটাই দরকার ?···আর তারপর বলল, নিজেকে এত নীচে নামাতে বোলো না। বরাবর তোমায় আমি নিকট আত্মীয়ের মতোই দেখতে অভ্যস্ত।···বুঝছি তোমার ঘাড়ে বোঝা হয়ে বসে আছি, ছুটি দেওয়া দরকার, কিন্তু এ পন্থায় নয়।
গৌতম বলল, আর দ্বিতীয় পন্থাতেই বুঝি রাজী ?
চিত্ত বলল, ওকে এখনো বলি নি। তবে মনে হয় রাজী করিয়ে ফেলতে পারব!
গৌতম গম্ভীরভাবে বলল, দানপত্র লিখে বসিস না চিত্ত, তুই নিজে তো ওর ভালবাসায় মরে পড়ে আছিস!
দূর থেকে স্টেশনের কোলাহলের আভাস কানে আসছিল, এই মাঠটুকু পার হলেই জলটুভি শেষ, রেল লাইন পড়বে।···তবে স্টেশন জলটুভিও নয় তেঙ্গুটিও নয়, 'নজরপুর।' তেঙ্গুটি থেকে একনজরে দেখা যায় বলেই এমন নাম কিনা কে জানে।
এখন দ্রুত হাঁটতে হচ্ছে, তবু একটু থামল চিত্ত, বলল, সে কথা অস্বীকার করতে পারছি না, কিন্তু আমি একা মরে পড়ে থাকলেই তো চলবে না ?

সেটা তাঁর সংস্কারে বাধছে। দু'দিন বাদে ঠিক হয়ে যাবে।

নাঃ।

চিত্ত সবেগে বলে, আমি চাই না ও আমায় লোভী ভাবুক, মতলববাজ ভাবুক! শ্রদ্ধা হারাক।···আমি তোকে অনুরোধই করছি গৌতম, তুই মনটা ঠিক করে ফেল। ওকে একটা মানুষের জীবনে দাঁড় করাতে না পারা পর্যন্ত আমার স্বস্তি নেই। তোরই কি হবে স্বস্তি?

গৌতম গম্ভীর হলো, গভীর গলায় বলল, চিত্ত, আমার তো মা আছে, বাবা আছে, একটা পারিবারিক জীবন আছে—

মানছি। সেসব আমার নেই তা নয়। কিন্তু সবকিছুর ওপরে আরও একটা জিনিস আছে, যেটার নাম মানবিকতা। ঠিক আছে—জোর করব না। জানতে পারলে টুনু লজ্জায় অপমানে মরে যাবে।·· তবে ভাববার জন্যে যদি সময় চাস, নে কটা দিন সময়। এই যে এসে গেছি।

টিকিট কাটবার সময় ছিল না, চিত্ত একটা বেগুনের ঝোড়ার পাশে জায়গা করে বসিয়ে দিলো গৌতমকে, বেগুনওলার হাতের মুঠোয় কিছু গুঁজে দিয়ে। ওদের মাস্থলি টিকিট এরকম কাজ হামেশাই করে থাকে এরা।···

ট্রেনের চাকার শব্দের সঙ্গে চিরদিনই কোনো এক একটা কথা ওঠে, কু ঝিক ঝিক, কু ঝিক ঝিক, চল বাড়ি যাই, চল বাড়ি যাই আবার এসো আবার এসো এমনি অনেক রকম শুনেছে গৌতম ছেলেবেলা থেকে। যতক্ষণ রেলগাড়ি চলে সেই কথাটা মাথার মধ্যে থেকে নামে না, যেন কোথায় আটকে গিয়ে পাক খেতে থাকে।···চিত্তর সেই প্রথম কথাটা তেমনি আটকে গিয়ে অবিচ্ছিন্ন পাক খেতে থাকে।···অথচ আশ্চর্য, তারপর কতো কথাই তো হলো! তবু সেইটাই গাড়ির চাকার সঙ্গে জড়িয়ে গেল কেন কে জানে। গৌতমকে তাই অবিরত শুনে চলতে হচ্ছে···'তুই শালা টুনুটাকে·· তুই শালা টুনুটাকে'।

নার্সিং হোম থেকে বৌ নিয়ে বাড়ি ফিরবে আজ জগদীশ, গেট-এ দাঁড়িয়ে

আছে প্রত্যাশিত গাড়ির অপেক্ষায়। নবজাত পৌত্রকে 'বরণ করে' ঘরে নিয়ে যেতে মা আসছেন তাঁর ভাইয়ের গাড়িতে। অতএব ট্যাক্সী ডেকে চলে যাওয়া যায় না, অথচ বৌ অনেকক্ষণ থেকে ছেলেকে সাজিয়ে গুছিয়ে এবং নিজে সেজে বসে আছে। বলা বাহুল্য ঘামছে আর রাগছে।···ওই তীব্র মূর্তির সামনে বসে থাকা অস্বস্তির, তাই জগদীশ গেট-এ এসে দাঁড়িয়েছে।

আজও সুব্রতর সঙ্গে দেখা।

একটা প্রসঙ্গ পেয়ে বাঁচল। বলে উঠলো, মাই গড্! আজও তুই? তোর সেই দিদি না পিসি এখনো রয়েছে এখানে?

দিদি।

সুব্রত বলল, আরো অনেকদিন থাকতে হবে। কেসটা তো তোর বৌয়ের মতো আদি ও অকৃত্রিম নয়।

ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেদিন বলেছিলি বটে, কী যেন শক্ত ব্যাপার।···তো দিদি না ছোট বোন রে?

প্রশ্নটা নিশ্চয়ই দুবার করার মতো নয়! বললাম তো দিদি!

জগদীশ তার নতুন শেখা ছ্যাবলা হাসি হেসে বলে উঠলো, আরে আমিও তো তাই বলেছিলাম বৌকে। তা আমার সঙ্গে তর্ক! বলে কক্ষনো দিদি নয়, তুমি ভুল শুনেছ।

সুব্রতর কপালটা কুঁচকে গেল।

বলল, এটা হঠাৎ একটা তর্কের সাবজেক্ট ম্যাটার হচ্ছে কেন? ব্যাপারটা কি?

জগদীশ একটু অপ্রতিভ হলো, তবু দাঁত বার করে হেসে বলল, আরে, অন্য কিছু না, সেই চিরন্তন মেয়েলি কৌতূহল। ওর মতে তুই আর আমি যখন সহপাঠী তখন তোর আর আমার বয়েস এক; অথচ পাশের ঘরের ওই পেশেন্টের চেহারা দেখলে মনে হয় বড় তো দূরের কথা আমাদের থেকে কম সে কম পাঁচসাত বছরের ছোট। কখনো দিদি নয়, নিশ্চয় ছোট।

সুব্রত তার এই 'বুদ্ধু' হয়ে যাওয়া সহপাঠীটির দিকে তাকিয়ে দেখল।

মুখের রেখায় ফুটে উঠলো ব্যঙ্গ হাসি। বলল, গিন্নীকে বলিস মনে হওয়াটাই সব নয়। সব মেয়ের বয়েসই কি বছরের হিসেবে বাড়ে? এমনও হতে পারে দু'বছর বাদে তোর বৌকে তোর 'দিদি' বলে মনে হবে।

অ্যাঁ কী বললি? বুঝলাম না ঠিক—

বৌয়ের কাছে বলে বুঝে নিস।

সুব্রত গটগট করে এগিয়ে গিয়ে 'পাশের পেশেণ্টের' ঘরের দরজার পর্দা সরিয়ে ভিতরে এসে ঢুকল।

মিলিদির খাটটা আজ আরেকটু তোলা। প্রায় সোজাই বসতে পেরেছে আজ। সবদিনের মতো মুখের দুধারে দুটো বেনী ঝুলছে, মুখটা বৈকালিক প্রসাধন মার্জিত তাজা তাজা!

এটি মিলির আয়ার ডিউটির অঙ্গ। তার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার উপায় নেই মিলির। স্নো পাউডার সেণ্ট সব কিছু সদ্ব্যবহার করতেই হবে তাকে এই বিকেলের দিকে।

মিলিদের এই ফ্রেশভাবটা দেখে সুব্রতর রাগের মনে হঠাৎ হাসি পেয়ে গেল। উল্লুক জগদীশটার বৌ ভুল বলে না···বলতে যাচ্ছিল কিছু তার আগেই মিলি বলে উঠলো, কা হলো?—এমন রণমূর্তিতে? কারু সঙ্গে ঝগড়া করে এলি নাকি?

এলাম!

সুব্রত বসে পড়ে বলল, আচ্ছা তোমার ওই পাশের ঘরের আহ্লাদী পেশেণ্টের সঙ্গে তোমার এতো মাখামাখি হয় কখন?

মাখামাখি?···মিলি হেসে ফেলে, আহা ও তো আর আমার মতো 'গাব্বু-পিল্' অবস্থা নয়। হাঁটে চলে এঘর ওঘর করে বেড়ায়। আসে যখন তখন।

তার মানে-সকলের হাঁড়ির খবর সংগ্রহ করে বেড়ায়। আশ্চর্য, অতটুকু মেয়ে, কী পাকা!

ওমা! পাকামির কী করল? বেশ তো বাচ্চা বাচ্চা কথা। আরে ও তো তোর বন্ধুর বৌ।

অতএব তোমার শান্তিভঙ্গ করার দাবি আছে ওর। বাচ্চা বাচ্চা কথা!
হুঁ। তোমার কত বয়েস জিগ্যেস করে নি?
মিলি হেসে উঠে বলে, কে বলল?
কেউ বলে নি, আমি বলছি। করেছিল কি না?
তা করেছিল বটে।
কী বলেছিলে তুমি শুনি?
বলেছিলাম? আরো হাসে মিলি, বলেছিলাম তার গাছ পাথর নেই।
হুঁ, তাতেই মন ওঠে নি। বরকে বলেছে, তুমি আমার দিদি—একথা দেখলে বিশ্বাসই হয় না। আমি বলেছিলাম, তোর গিন্নীকে বলে দিস, জানে না বুঝি সুন্দরী মেয়েদের বয়েস বাড়ে না।
এই সুবু, বড্ড যে ফাজিল হয়ে উঠেছিস দেখছি।
তা কী করব! এত রাগ হয়েছে।
আহা এতে রাগের কি আছে?
সে তুমি বুঝবে না! টোন্ ভালো নয়।
তুই যে দেখছি আমার থেকেও বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছিস।···যাক আজকাল এত সময় বার করছিস কোন্ ভাঁড়ার থেকে? ঘন ঘন আসছিস।
কই? দু-তিনদিন তো আসি নি।
তা আসিস নি বটে! তা হ্যাঁরে আমায় দেখে গিয়ে পিসিমাকে খবরটা দিস না?
হঠাৎ বুকটা চমকে ওঠে সুব্রতর। এখানেও যেন টোন্‌টা ভালো নয়। তবু অবহেলা ভাব দেখিয়ে বলে উঠলো, একথা আবার কে বলতে এলো?
স্বয়ং পিসিমা। তোর মা জননী।
কে? মা? মা এসেছিলেন?
হুঁ! অনেকদিন আসতে পারছেন না বলে দুঃখে মরে যাচ্ছিলেন। অনেক তোড়জোড় করে এসেছিলেন, তুই আসিস শুনে আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, 'সেই তো একদিন ঠেলে ঠেলে পাঠিয়েছিলাম। আরও এসেছে? আহা তা খবরটা দিবি তো গিয়ে? দেখলাম বেশ বিস্মিত এবং যেন

আহতও।

সুব্রতকে এখন রাগী দেখাল।

বলল, ঘুরতে ঘুরতে রাত করে ফিরি অত মনে থাকে না। এতে আহত নিহত হবার কী আছে?

নাঃ তোর দেখছি আজ মেজাজ টঙে। দেখতে আসতে পারেন না, মন ছট-ফট করে, হাঁফাতে হাঁফাতে এসেছেন। তুই আসিস-টাসিস জানলে শান্তিতে থাকতেন।···তোর সঙ্গেও আসতে পারতেন। পাড়ার কোনো একটা ছেলেকে ধরে এনেছেন।

সুব্রতর হঠাৎ খুব খারাপ লাগে।

যেন ওর কোনো একটা গোপন অপরাধই ধরা পড়ে গেছে। অথচ সত্যিই কিছু অপরাধ নয়।···সেদিন মার তাড়নায় দেখতে এসে বেচারী মিলিদির নিঃসঙ্গ অবস্থাটা অনুভব করে বড় মায়া-মায়া লেগেছিল।···আহা সেই মিলিদি! কত ঔজ্জ্বল্য, কত সুখ, কত প্রতিষ্ঠা।···সেই যে বলে রামেও মেরেছে, রাবণেও মেরেছে, এ প্রায় তাই। জামাইবাবুটা না-হয় শয়তান, ভাগ্যই বা কম কী? এমন একটা অসুখ দেবার দরকারটা কী ছিল?

সেই মায়া মায়া মনটাই সুব্রতকে প্রায়ই এই বিকেলের দিকে এই নার্সিং হোমের দিকে টেনে নিয়ে আসে।···সেটা বাড়িতে প্রকাশ করতে কেমন লজ্জা করে যেন। তাই আর বলা হয় না।

কিন্তু কী আশ্চর্য! কারুর প্রতি একটু বাড়তি মায়া প্রকাশও সমাজে বে-আইনী? জগদীশটার কথার সুরে যেন একটা রহস্যের ইশারা, মা 'আহত বিস্মিত হতচকিত' হয়তো বা আরো কত কী!

অথচ এই মা-ই মিলিদির কথা তুলে এ যুগের হৃদয়হীনতাকে ধিক্কার দিয়েছে। বলেছে, কত ভালবাসতিস মিলিদিকে, মিলিদি মিলিদি করে পায়ে পায়ে ঘুরতিস! একটু মনে পড়ে না বাবা?

তার মানে হে পুত্র কন্যা—ভালবাসো কর্তব্য করো, মায়ামমতা দয়া করুণা যা কিছুই করো, গার্জেনকে জানিয়ে, দেখিয়ে। তোমার বাইরের এবং ভিতরের সমস্ত গতিবিধি, যেন তাঁদের জ্ঞানগোচরে থাকে।

মিলিদি, আবার বলল, সেকালের মানুষ তো, ওদের আবার সেন্টিমেন্ট-ফেন্টিমেন্ট একটু বেশী।

ঠিক আছে। আর আসবো না। তিনিই আসবেন পাড়ার ছেলেকে ধরে।

ওমা!

মিলিদি গালে হাত দেয় এ যে একের দোষে অন্যের দণ্ড! আমি বলে হাঁ করে থাকি তোর জন্যে। তবু দুটো সাধারণ কথা কয়ে বাঁচি।···নে রাগ রাখ কলা খা। বলে মিলি হাত বাড়িয়ে মীটসেফের ওপরে রাখা কলার ছড়া থেকে দুটো মোটাসোটা কলা এগিয়ে দেয়। রীতিমতো মোটা।

সুব্রত বলল, নমস্তে! এই কলা একজোড়া খাওয়া একমাত্র হনুমানজীর পক্ষেই সম্ভব।

একটা নিল।

মিলিদি বলল, অথচ দেখ আমার জন্যে এক ডজন মজুত! কারণ আমার পুষ্টির দরকার।

সুব্রত একটু গলা নামিয়ে বলল, সে পুষ্টিটা বোধহয় তোমার আয়ারই হচ্ছে।

উঃ! তুই আচ্ছা কুচুটে হয়েছিস তো আজকাল।

মিলি হেসে ফেলে বলে, তা কী করব বল? রোজ রোজ আমার ওপর যে গন্ধমাদন পর্বত চাপানো হয়, সেটার যদি শেয়ার না করি পচাফলের ভারে মীটসেফ ভেঙে পড়বে যে।

সুব্রত বলতে যাচ্ছিল, কে নিয়ে আসে? সেটা বলল না। ঘুরিয়ে বলল, এই গন্ধমাদনটি চাপিয়ে চলেছে কে?

মিলিদি রগের পাশে হাত বুলিয়ে নিয়ে বলল, দাদা।

দাদা! কে নীরেনদা? আসে রোজ?

এই দেখ বোকার মতো কথা। বেকার না কি, তাই আসবে রোজ? কাজের চাপে বলে নিশ্বাস ফেলার সময় নেই। তবু তার মধ্যে থেকেই মনে করে অফিসের পিয়নকে দিয়ে নিউ মার্কেট থেকে কিনিয়ে পাঠিয়ে পাঠিয়ে দেয়!

তাই বল! দাদা শুনে তো অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম।

ফের সেই কুটিল কথা? মিলি একটু উদাস গলায় বলল, তাই বা কে করে বল? তাছাড়া—দাদাই তো সব করছে।

কথাটা সত্যি। মিলির দাদাকে নিন্দে করা যায় না। বোনের এই রাজকীয় রোগের প্রভূত খরচ সবটাই তো দাদা বহন করছে। এবং প্রায়ই নার্সিং হোমের কর্তৃপক্ষকে টেলিফোন যোগে দরাজ ঘোষণায় জানিয়ে দিচ্ছে, টাকার জন্যে পরোয়া করি না আমি, যতদিন রাখবার দরকার বোঝেন, রাখবেন।

ডিভোর্সী বোনের জন্যে এমন উদার ঘোষণা কে করে? ব্যাচিলার নয়, বিপত্নীক নয়, সংসারী লোক। টাকার সীমা সংখ্যা নেই? তাতে কি? অনেকেরই তো এমন থাকে না, কে কার কত করছে?···টাকাগুলো না কি কালো? তাতেই বা কী? কালোছেলের উপর কি বাপের ফর্সা-ছেলের থেকে মায়া কম হয়? ··

নাঃ নীরেনকে মহানুভবই বলতে হয়।

সমীরণ যখন ডিভোর্স চেয়ে বসেছিল, তার সব ঝড়-ঝাপটা তো নীরেনই বয়েছিল।···মিলি এক কথায় বিনা শর্তে স্বামীর প্রার্থনা পূরণ করেছিল তাই নইলে তো লড়তেও চেয়েছিল। বলেছিল, এমন প্যাঁচ কষতে পারি যাতে বাছাধনের বিয়ের শখ জন্মের মতো ঘুচিয়ে দিতে পারি।

মিলিই নিবৃত্ত করেছিল।

তারপরও দাদার সাহায্যেই একটা চাকরি জুটিয়ে নিতে পেরেছিল মিলি আর দাদার হস্তক্ষেপেই একটা 'ওয়ার্কিং গার্লস হোস্টেলে' জায়গা জুটে-ছিল।

এইভাবেই জীবনটাকে গুটিয়ে নিয়েছিল মিলি, এইভাবেই চালিয়ে চলবে ঠিক করেছিল, কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, ধরা পড়ল এই কঠিন ব্যাধি। অবশ্য চিকিৎসার ত্রুটি হচ্ছে না, সেরেও উঠবে একদিন এ আশা দেখা দিচ্ছে। কিন্তু সেরে উঠে গিয়ে এখন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে কোথায়? চাকরিই কি করতে পারবে আর? পারবে হোস্টেলে থাকতে?

কলাটা শেষ করে সুব্রত সিগারেট ধরিয়ে বলল, আজ একটা ঘটনা ঘটেছিল, ভাবছি তোমায় বলি কি না বলি।

মিলিদি বলল, বলার মতো হলে বলবি, না হলে বলবি না। এর আর ভাবনার কী আছে?

আহা 'বলবার মতো' কিনা এটাই তো বিচার্য।

তাহলে বলেই ফেল। আমিই বিচার করি বলে ফেলে ঠিক করলি না ভুল করলি।

তাই বলছ? আচ্ছা বলেই ফেলি—

সুব্রত একটুক্ষণ ধোঁয়া উড়িয়ে, চট করে বলে উঠলো, আজ সকালে সমীরণ-বাবুর সঙ্গে দেখা—

মিলির বোধহয় এটা আদৌ প্রত্যাশার মধ্যে ছিল না, মিলি কি তাই হঠাৎ ভিতরে ভিতরে চমকে উঠলো? ভিতরে চমকালো কি না দেখা গেল না, তবে মুখের রংটা যে একটু বদলে গেল সেটা দৃশ্যমান।···মিলির রক্তশূন্য ফাকাসে মুখটা লাল দেখাল।···কিন্তু মিলি কথা কইল একেবারে সুব্রতর উৎসাহের আগুনে বরফজল ঢেলে।

বলল, এই তোর মস্ত একটা ঘটনা? একই শহরে বাস করতে করতে হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়ে যাওয়া, আশ্চর্যের কী?

সুব্রত এটা আশা করে নি।

ভেবেছিল হয় মিলিদি বলে উঠবে, ওর নাম আমার সামনে উচ্চারণ করিস নি। নয়তো কৌতূহল দেখাবে, কোথায় কখন কী অবস্থায়?

এই গাছাড়া কথায় সুব্রত প্রথমটা কথা খুঁজে পেল না, তারপর বলল, না ঠিক শুধু দেখা হওয়া নয়, দারুণ সৌজন্য দেখাল ভদ্রলোক।···রাস-বিহারীর মোড়ের কাছে বাসের জন্যে অপেক্ষা করছি, দেখি হঠাৎ গায়ের কাছে ঘ্যাঁচ করে একটা গাড়ি থেমে গেল। পিছনের সীটে কেউ নেই, একাই নিজে চালিয়ে যাচ্ছিল—

মিলি বলল, ছোট গাড়িটা বুঝি?

তা তো জানি না। ছোট বড় মেজ সেজ অনেক গাড়ি আছে বুঝি?

মিলি সহজভাবে বলল, হ্যাঁ বলে যা, 'ন' নতুন ফুল রাঙা কনে!' অত কিছু না ছুটোই তো ছিল তখন। বড়টা ড্রাইভার চালাত। বেচে খেয়েছে হয়তো!···অবহেলার ভঙ্গিতেই বলল।

সুব্রত মনে মনে হাসল।

বলল, হতে পারে। তবে এটাও একটা অ্যামবাসাডারই। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, আরে সুব্রত না? কোন্‌দিকে যাচ্ছ?

আমার তো ওনার ওই সপ্রতিভ ভাব দেখে এই স্যান রাগ হলো, কথা বললাম না, শুধু যেদিকটায় যাব সেটা হাত নেড়ে দেখিয়ে দিলাম।···দেখি দরজা খুলে নেমে এলো। স্রেফ আগের মতো কাঁধে হাত দিয়ে বলল, উঠে এস না। একসঙ্গে যাওয়া যাক কথা বলতে বলতে।

বাসস্টপের দাঁড়িয়ে থাকারা আমার এই সৌভাগ্যে বোধহয় হিংসেয়, মরে গেল। বুঝলাম, তবু বললাম, না, না, এই তো এক্ষুনি বাস পেয়ে যাব।··· বলল, সেতো যাবেই। তবে আমি যখন হঠাৎ তোমায় পেয়ে গেলাম, একটু কথা বলতে বলতে যেতাম।···আশপাশের লোকগুলো এত তাকা-চ্ছিল, যে উঠে আসা ছাড়া গতি ছিল না।

উঠলি?

উঠলাম, আর কী করবো। লোকেরা কী ভাববে ভেবেই! গাড়িতে উঠিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ, তারপর হঠাৎ রাশি রাশি কথা।

মিলি অবহেলার গলায় বলল, তোর সঙ্গে আবার এত কী কথা?

আমি তো উপলক্ষ মাত্র। নিজের কথাগুলো বলে ফেলে বাঁচার জন্যেই বলা।···তবে প্রধান কথা হচ্ছে ওঁর সেই সুন্দরী তরুণী পাঞ্জাবী বৌ ওঁকে ছেড়ে দিয়ে কেটে পড়েছে।

মিলি যেন এ খবরের জন্যে প্রস্তুতই ছিল, তাই তেমনি অবহেলায় বলল, ওটা তো জানা কথাই।

বাঃ! জানা কথাই কেন? সমীরণবাবু তো বলতে লাগছিল এ শুধু তার ভাগ্যটাই অভিশপ্ত বলে!

মিলি ও কথার উত্তর না দিয়ে বলল, বলতে আর কী কাঠখড় লাগে বল?

ডিভোর্স হয়ে গেছে বোধহয় ?

দরকার হয় নি। সে ঝঞ্ঝাট বেঁচেছে। ওর নাকি আগের সত্যি বিয়ের একটা সত্যি বর ছিল, সে এসে হামলা করে বৈধ পত্নীকে জোর ফলিয়ে নিয়ে গেছে, এবং সেই মহীয়সী মহিলা স্ট্যাম্প কাগজে লিখে দিয়ে এবং লিখিয়ে নিয়ে গেছেন, এখানে তিনি এই বাংগালীটার সঙ্গে 'অবৈধ' ভাবে বাস করতেন, অতএব কোনো পক্ষই আদালতের শরণ নিতে গেলে সুবিধে করতে পারবে না। পরে জানা গেছে মেয়েটা না কি নিজেই চিঠি লিখে সত্যি বরকে আনিয়েছিল।···

মিলি একটু হেসে বলল, বেচারা !

কে বেচারা ?

এই তোদের সমীরণবাবু।

তুমি এখনও ওকে 'বেচারা' বলতে পারছো ?

আহা, বেচারাকে বেচারা ছাড়া কী বলব ?

দেখি, সবটা শুনে কী বল। সাহেব এখন আর একটি বৈধ বিয়ে করতে কোনো গণ্ডগ্রামের নিরক্ষর মেয়ে খুঁজছেন, জীবনটাকে নতুন ছাঁচে গড়া যায় কি না দেখতে।

কথা শেষ হতে দেয় না মিলি, আচমকা হি হি করে হেসে উঠে বলল, তোকে ঘটকালির ভার দেয় নি তো ?

সুব্রত হাসল, এত সাহস হবে না। তবে মিথ্যে বলব না যখন নাক মুছে মুছে রুমাল-ফুমাল ভিজিয়ে ফেলে দুঃখগাথা নিবেদন করছিল, তখন একটু মন কেমন করছিল। আসলে তো একসময়—মানে তখন তো লোকটাকে প্রায় 'হীরো'র পর্যায়ে তুলে রেখেছিলাম।

মিলি যেন একটা কৌতুকের দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে দেখল, কিছু বলল না।···সুব্রত বলল, সে যাক, শুধু শুধু অনেকটা বেশী রাস্তা ঘুরিয়ে, বাড়তি তেল পুড়িয়ে নামিয়ে দেবার সময় চোরের মতো মিনমিন করে বলল, তোমার মিলিদি কেমন আছেন ?

এখন মিলি বলে উঠলো, থামা দে সবু ! আমার আবার বেশী হাসি সয় না।

থামাই দিচ্ছি, আর বিশেষ কিছু না। বললাম 'খুব ভালো আছে।'···বলল, 'জানি জিগ্যেস করা আমার মানায় না, তবু। শুনেছিলাম এবার বোধহয় নার্সিং হোম থেকে ছাড়া পাবে। ডাক্তার বলেছে—

সুব্রত আর একটা সিগারেট বার করল। হাতের তেলোতেই ঠুকে লাইটার দিয়ে জ্বালিয়ে নিয়ে বলল, বললাম, তাহলে তো আপনি আমার থেকে বেশী জানেন। বলে চলে এলাম। তবে দেখে বেশ খারাপ লাগছিল, চেহারাটা এমন বিশ্রী হয়ে গেছে।

মিলি দরজার দিকে তাকাল।

কিম্বা দেয়ালের দিকে।

অথবা কোনোদিকেই নয়, শুধু অবহিত করে দেওয়ার গলায় বলে উঠলো, সুবু, ফার্স্ট বেল বেজে গেছে মনে হচ্ছে—

তাই না কি ? খেয়াল করি নি তো—

সুব্রত উঠে পড়ল।

কেউ যে নীরব ভর্ৎসনার দৃষ্টি নিয়ে এসে দরজায় প্রহরীর মতো দাঁড়াবে, এটা অসহ্য।

ও চলে যেতেই মিলি আয়াকে ডেকে বলল, বেডটা ঠিক করে দাও।

আয়া হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উঁচু করে রাখা খাটটাকে বেড করে দিলো। শুয়ে পড়তে হলো না, আপনিই শুয়ে পড়া হয়ে গেল। মিলি চোখ বুজে চুপ করে শুয়ে রইল কিছুক্ষণ, কিছুই ভাবল না। যেন অবসন্ন শরীর আর অবসাদগ্রস্ত মনটাকে নিয়ে একটা চিন্তাহীন আরামের সমুদ্রে ডুবে যাওয়া ছাড়া আর কোনো কিছু নেই তার জীবনে।

তারপর আস্তে আস্তে সেই তলিয়ে যাওয়া থেকে উঠে আসতে থাকে হালকা কুয়াশার মতো একটা অদ্ভুত চিন্তা···এই জীবনটাই যদি স্থায়িত্ব নিয়ে আয়ুর শেষ তারিখে পৌঁছে দেয়, কী ক্ষতি হয় তাতে? এই নিজের সম্পূর্ণ ভারটাকে অন্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে শুধু শুয়ে থাকা, শুধু অলসতার নেশায় নিজেকে ডুবিয়ে রাখা, এমনকি দেহটাকে পর্যন্ত শোওয়ানো

ওঠানোর দায়িত্ব নেই, তার জন্যে রয়েছে কৌশলী খাট বিছানা। এও তো এক ধরনের সুখ।···চরম আরামের আর পরম নিশ্চিন্ততার সুখ।···

কেন তবে মিলি এ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে দিন গুনছে? এই আবেশের জীবন থেকে বেরিয়ে পড়ে আবার আর কোনো জীবনের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে বসবে মিলি?···পিসি বলে গেছেন, আর তো তোর হোস্টেলে গিয়ে থাকা হবে না—তোর জন্যে আমার ঘরের পাশের ঘরখানা সাজিয়ে গুজিয়ে রাখছি। ঘরটা ছোট বটে, তবে হাওয়া আলোর অভাব নেই।···বড় বৌমা বলেছিল, আয়া তো এখন আরো কিছুদিন রাখতেই হবে, তিনতলার নতুন ঘরখানায় ব্যবস্থা করলে হতো! চারিদিক খোলা তো. আমি বলে দিয়েছি, আমি তো বাছা চোদ্দবার সিঁড়ি ভাঙতে পারব না, তাহলে মেয়েটাকে দিনান্তে ক'বার দেখতে পাবো? ও আমার কাছাকাছিই থাকবে।···

পিসির নিজের মেয়ে নেই, কম বয়সে মা-মরা এই ভাইঝিটি তাঁর বিশেষ আদরের, এবং যেন নিজস্ব একটা সম্পত্তিসদৃশ।···মিলির বিয়ের সময় পিসিই সর্বময়ীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।···বাবাকে মনে পড়ল মিলির, কেমন যেন নিরুপায় নিরুপায় ভঙ্গিতে বলেছিলেন, মানছি ছেলে খুবই কৃতী, অবস্থাও ভালো কিন্তু শুধু একা ছেলে, মা নেই বাপ নেই কাকা জ্যাঠা দাদা কেউই নেই, সম্বন্ধটা কি তুই বেশ ভালো মনে করছিস সরস্বতী?

পিসি বাবার এই দ্বিধাকে প্রবল বেগে উড়িয়ে দিয়ে বুঝিয়েছিলেন, কেউ নেই সেটাই তো সুবিধে। মেয়ে গিয়েই স্বাধীনতার সুখ পাবে, কর্ত্রীত্বের গৌরব পাবে।···কারুর মন রক্ষার আর মান রক্ষার দায় পোহাতে হবে না! একি কম সুখ? মেয়েদের জীবনে এটাই তো কাম্য বাপু। ভেবে দেখো ওই অতবড় বাড়ি, দু'দুখানা গাড়ি, কাজের লোকজন, হালফ্যাসানের সাজানো গোছানো, সবকিছুর মালিক হবে মিলি একা। ভাগীদারের বালাই নেই, এ সম্বন্ধ তোমার পছন্দ হচ্ছে না দাদা? কেউ নেই কেন, একটা দিদি তো আছে?

সে তো সতাতো দিদি। গ্রামে থাকে।

সে তো আরো ভালো। বরণ করে ঘরে তোলবার সময় করবে কম্মাবে। পরে মিলির ওপর বেশী খবরদারি করতে আসবে না, স্বস্থানে প্রস্থান করবে।

সমীরণের সেই সতাতো বড়দিদির মুখটা হঠাৎ মনে পড়ল মিলির। বোকাটে বোকাটে গ্রাম্য গ্রাম্য। তিনিও যে একদা এ সংসারের দুহিতা ছিলেন, সে কথা ভাবার সাহস তাঁর ছিল বলে মনে হয় নি। হয়তো সে বোধই ছিল না। কোন্‌কালে বিয়ে হয়ে তদবধি বর্ধমানের কোনো গ্রামে পড়ে আছেন, সৎমার সংসারে কোনোদিন প্রবেশাধিকার ঘটেছে বলে মনে হয় নি মিলির।

নতুন কনে মিলির কেমন অস্বস্তি হয়েছে, চেষ্টা করেছে তাঁকে সম্যক মান মর্যাদা দেবার, কিন্তু কাজ করার লোকজনেরা গ্রাহ্যমাত্র করে নি, এমন কি সমীরণ পর্যন্ত বলেছে, ওঁকে নিয়ে এত মাতামাতি করার কী আছে। দিদিকে আমাদের সঙ্গে কালীঘাটে নিয়ে যাওয়া হলো সেই তো যথেষ্ট, আবার ওঁকে নিয়ে থিয়েটার দেখতে যেতে হবে? পাগলামি কোরো না।

কোনোখানে কোনো সাদৃশ্য নেই, তবু মিলির হঠাৎ মনে হলো মিলি যেন সেই দিদির সমগোত্র হয়ে গেছে।

মিলির দাম্পত্যজীবন ভেঙে যাওয়ায় পিসি যেন নিজেকে একটু অপরাধী অপরাধী ভেবেছে। যদিও তখন মিলির বাবা নেই, তবে মিলির দাদা বৌদি তো ছিল। কিন্তু সে জীবনটা ভাঙল কেন?·· দাদা বলেছিল, 'অ্যাডজাস্ট করবার ক্ষমতার অভাবে। ছোট থেকেই তো মিলির মধ্যে ও জিনিসটা নেই।'

হয়তো তাই।

হয়তো সমীরণ যখন প্রতিরাত্রে বেহেড মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরতো আর প্রায় রোজই গাড়িতে ওই বেহায়া পাঞ্জাবী মেয়েটাকে দেখা যেত, তখনও মিলির অ্যাডজাস্ট করে নেওয়াই উচিত ছিল।···কিন্তু কেউ যদি তোমাকে গায়ের কাছ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়, যদি বলে, তোমার মতো

মোমের পুতুলকে নিয়ে ঘর করা আমার দ্বারা হবে না। তুমি আমার জীবনের শনি, আমার সুখের হন্তারক, তোমার ছায়া পর্যন্ত সহ্য হচ্ছে না আমার—'

তাহলে কোন্ পথ দিয়ে অ্যাডজাস্ট করা যায়? সেই দুঃসহ দিন-রাত্রি-গুলো মনে পড়লে এখনো যন্ত্রণায় মাথার মধ্যে ইঞ্জিন চলে যায়।···ক্রমশ সেই মেয়েটাকে বাড়িতে নিয়ে এসে উঠেছে সমীরণ, যতদূর নয় ততদূর বেহেড কাণ্ড করেছে। ওই মেয়েটাকে দিয়ে মিলিকে অপমান করাতে চেয়েছে। আর—

বুকটা কেমন করে উঠলো মিলির।

কিন্তু এসব তো সে কাউকে বলে বেড়ায় নি। দাদাকেও না। শুধু বলেছে 'থাকা সম্ভব হলো না।' তবে আর দাদা ভাববে না কেন মিলি যদি এক অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারতো—

তবু দাদাই তো তার চাকরি ঠিক করে দিয়েছিল, থাকার ব্যবস্থাও। পিসি রেগে আগুন হয়েছে তাতে। বলেছে, কেন তোর বাপের তৈরী বাড়িতে তোর থাকবার অধিকার নেই? মিলি স্বেচ্ছায় নির্বাসন দণ্ড গ্রহণ করেছে। মিলি দাদা বৌদির সুখের সংসারে একটা অবান্তর জিনিস হয়ে থাকতে চায় নি।···সুখের হন্তারক হতে তার বড় ঘৃণা।···

পিসি বলেছে, তা একটা কেরানিগিরি চাকরি ছাড়া আর জুটল না? শহরে এত ইস্কুল কলেজ, মাস্টারী করা যেত না?

মিলির তাতেও অনীহা।

একটা অপরিচিত জগতের এককোণে একটু ঠাঁই পেয়েই হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল।

সেটাও সইল না মিলির।

এখন মিলিকে আবার অন্য একটা সংসারে জিজ্ঞাসার চিহ্নেরমতো বিরাজ করতে হবে।···তবে কেন মিলি ভাবতে বসবে না, আয়ুর শেষ দিনটা পর্যন্ত যদি নার্সিং হোমের এই খাটটায় কেটে যেত।···অবসাদের তলায় তলিয়ে গিয়ে শুধু নিজেকে ডুবিয়ে রাখা, এও তো একরকম সুখ।

অথচ আশ্চর্য মিলির ঘুণধরা মেরুদণ্ড না কি আবার সতেজ হবার প্রতি শ্রুতি দিচ্ছে। তবে? তবে আর আয়ুর শেষ দিনটা নিকট হবে কী করে?

অবচেতনার স্তর থেকে চেতনার জগতে উঠিয়ে নিয়ে এলো আয়া স্বপ্নার ডাক, দিদি খেয়ে নিতে হবে এবার।

আবার খাটের হ্যাণ্ডেল ঘোরাচ্ছে।

কিন্তু হঠাৎ চেতনার জগতে ফিরে এসে খেয়াল হলো মিলির সুব্রতর সেই কথাটাই এতক্ষণ ধরে ভেবে চলেছিল মিলি।···'চেহারা এত খারাপ হয়ে গেছে।···দেখে মায়া এলো।'···চেহারা এত খারাপ হয়ে গেছে!···মিলি ভাবল অত মদ খেলে চেহারা খারাপ হয়ে যাবে না?

মিলি মনকে শক্ত করে নেয়।

আশ্চর্য! তখন আর একটা কথা কোথায় যেন একটানা উচ্চারিত হয়ে চলে, তোমার মিলিদি কেমন আছেন?

'তোমার মিলিদি—'

ছোড়দার ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে রুবি নিজেকে দেখছিল নিরীক্ষণ করে। রুবিদের বাড়ির যেন সবই বিচ্ছিরি!··· এতবড় একটা আইবুড়ো মেয়ে থাকতে মা ছেলের বিয়ে বিয়ে করে পাগল। মাদের আমলে এমন কথা ভাবতে পারতো কেউ? হতে পারে সে ছোড়দার থেকে পাঁচ-ছ বছরের ছোট, কিন্তু চব্বিশ বছরটাই কি কম? ছেলেদের আর মেয়েদের বয়েসের হিসেব কি এক নিয়মে চলে?···অথচ এই এখন যাওয়া হচ্ছে ছোটবাবুর কনে দেখতে।

বড় ছেলের বিয়ে দিয়ে তো সুখের সাগরে ভাসছে মা জননী। রাতদিন সমালোচনা। আবার এক্ষুনি ছোট ছেলেটাকে 'দেবীচরণে' উৎসর্গ করে দিতে ইচ্ছে করছে?

চুল আঁচড়ে জোরে জোরে মুখে স্নো ঘসতে থাকে রুবি।···আরো দু' চার রকম উপকরণ নিয়ে এসেছে তিনতলার এই ঘরে। তাকেও তো কনে দেখতে যেতে হবে। মা বলেছে খুব ভালো করে সাজবি, যেন তোকে

ওদের মেয়ের থেকে নীরেস না দেখায়।

এটা অমিতার একটু পলিটিকস।

মুখে যাই বলুন মনের বাসনা এই ছুতোয় তাঁর মেয়েটারও যদি কনে দেখা হয়ে যায়।···গিন্নীর না কি একটি 'সুপাত্র' ভাইপো আছে।···একথা রুবি জানে না। রুবি প্রাণপণে সাজছে যাতে ভাবী বৌদির থেকে নীরেস না দেখায়।

গৌতমের অনুপস্থিতিতে তার এই ঘরখানাতেই রুবির বাসা।···নীচের-তলার হিজিবিজি থেকে চলে এসে দিব্যি আস্ত একখানা নির্জন ঘরে গা-হাত মেলে শোওয়া বসা বইপড়া চুলবাঁধা, কম আরামের?···গলায় পাউডার বুলোতে বুলোতে রুবি এই আলনা আরশি খাট বুকসেলফ টেবল ল্যাম্প ইত্যাদি দিয়ে সাজানো ছিমছাম ঘরখানার দিকে প্রায় ঈর্ষার দৃষ্টিতে তাকাল।···যখনই আসে তাকায় এইভাবে। আজ আরো বেশী।···এই ঘরখানায় রুবির আর কোনো আধিপত্য অধিকার থাকবে না।···কাদের না কাদের একটা মেয়ে এসে এঘরের দখলদার হয়ে বসবে। হয়তো এসেই রুবির হাতের গোছানো সাজানোগুলো উল্টে পাল্টে নাককুঁচকে নিজের পছন্দমতো সাজাতে বসবে।···রুবির কিছুই বলবার থাকবে না।···অথচ এখন মা একখানা বই টেনে নিয়ে দেখে বাঁকা-চোরা করে রাখলে রুবি মাকে বকে দেয়।

তখন রুবির এঘরে এসে একটু বসলেও নিজেকে হ্যাংলা হ্যাংলা লাগবে।··· দাদার ঘরে ঢুকতে তো তাই মনে হয়। ঢুকলে কেউ কি কিছু বলে? তা' অবশ্যই নয় তবু রুবির ভালো লাগে না!···হ্যাংলা আর বোকা বোকা লাগে নিজেকে।···

দু'দিন পরে এঘরে ঢুকতেও তাই হবে। তার ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্ছে! এ মেয়ে না কি সুন্দরী।···মার যেমন বুদ্ধি, রাজ্য খুঁজে সুন্দরী বৌ আনবেন! বড় পুত্তুর তো খেঁদির পায়েই মাথা মুড়িয়ে বসে আছেন, সুন্দরী পেলে ছোট কী করেন দেখ। বোধহয় নীলডাউন হয়েই থাকবে সর্বদা!

যত পারছে ফর্সা হবার চেষ্টা করছে রুবি, আর মনে মনে এই সব আউড়ে

যাচ্ছে।···মেয়েদের জীবন এক অদ্ভুত! চিরকালের জায়গা, যার নাম জন্মস্থান, সেখানে পায়ের তলায় একটু মাটি নেই, জলের লতার মতো আলগা হয়ে ভাসছে, কবে কে এসে তোমার সেই আলগা শেকড় উপড়ে নিয়ে চলে যাবে।···নিয়ে গিয়ে কোথায় রাখবে, কেমন ব্যবহার করবে কিছুই জানা নেই।

এসবও ভাবছে, আবার চব্বিশ বছরের আইবুড়ো মেয়েকে ফেলে উনত্রিশ বছরের ছেলের বিয়ে বিয়ে করে পাগলহওয়া দেখে রাগেও গা জ্বলছে।···

হঠাৎ পিছন থেকে আয়নার উপর একটা ছায়া পড়ল!···

ঝপ করে ঘুরে দাঁড়াল, ছোড়দা। তুই এ সময়? শরীর ভালো আছে তো?

গৌতম অফিসের জামাটামা সুদ্দুই বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়ে বলে, ব্যাঙ্কে স্ট্রাইক ডিক্লেয়ার করে বসল। চলে এলাম।

কে বসল?

চিরদিন যারা এসব করে থাকে।

রুবি বলল, সত্যি? না কি, তুইও কনে দেখার দলে ভিড়ে যাবার তালে কেটে পড়েছিস?

ওর মনে হলো না বোধহয় তলে তলে—

কিন্তু গৌতম ছিট্‌কে উঠে বসল, কী দেখবার তালে?

মশাইয়ের কনে! যাচ্ছি তো আমরা। যাবি তো বল? বরের বন্ধু বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে।

রুবি ভাবছিল, ছোড়দা তার 'সাজ' নিয়ে খুব কহাত নেবে। ব্যঙ্গ করবে, ধিক্কার দেবে, প্রশ্ন করবে কনে দেখতে যাচ্ছে, না দেখাতে যাচ্ছে?···

কিন্তু সেদিক দিয়ে গেল না ছোড়দা, বরং স্বভাব ছাড়া গম্ভীর গলায় বলল, কনে দেখাদেখি বন্ধ করতে বলগে মাকে। আমি এখন বিয়ে-ফিয়ে করছি না।

শোনো কথা!

এই গাম্ভীর্যটা রুবিকে একটু দমিয়ে দিলেও, সে তো ছাড়বার পাত্রী নয়। চড়াগলায় বলল, ছ-মাস ধরে কনে খোঁজা হচ্ছে, কই এতদিন তো একথা

বলিস নি ?

গৌতম দৃঢ় হলো, আমার সঙ্গে পরামর্শ করে কনে খোঁজা হয় নি। অনুষ্ঠান করে পরামর্শসভা উদ্বোধন করা হবে না কি ? বাড়িতে পরামর্শ হচ্ছে, শুনছিস না বুঝি ? চললাম। চারটেয় তাদের গাড়ি আসবে নিতে।

গৌতম বলল, রুবি, আমি বলছি—মাকে বলগে, এসব বন্ধ করতে।

আর কিছু না।

রুবি ব্যাপারটাকে হালকা করার চেষ্টা চালায়, তাদের বলে এতক্ষণে চপের পুর তৈরী আলুসিদ্ধ রেডি, কচুরির ময়দামাখা হচ্ছে—ফ্রিজে মিষ্টি মজুত !

গৌতম এখন উঠে বসল, স্থির গলায় বলল, ফাজলামি করে কোনো লাভ নেই। তুই না পারিস আমি গিয়ে বলছি মাকে। আমার পক্ষে এখন বিয়ে করা অসম্ভব।

এ ছোড়দা রুবির অচেনা।

রুবি ভয় পায়। হঠাৎ বিছানার একধারে বসে পড়ে বলে ওঠে, তোর কি হয়েছে বল তো ছোড়দা ?

হবে আবার কী ? যা পালা !

গৌতম ফের শুয়ে পড়ে বলে ফালতু একটা ছুটি পেলাম, ঘুমোতে দে। ভারী টায়ার্ড লাগছে।

এরপর আর কথা বলার সাহস হয় না রুবির। কিন্তু মাকেই বা বলবে কি ? নির্ঘাত কিছু একটা হয়েছে। সেই সেদিনকে সেই পাজী বন্ধুটার সঙ্গে কোথায় যেন রাত্তির কাটিয়ে আসার পর থেকেই ছোড়দার যেন অন্য-ভাব। মা যে অত বকল, রাগ করল না কেমন যেন চুপচাপ। এমনকি দাদা যখন উপদেশ দিতে এলো, সংসারের একটা নীতি নিয়ম আছে পারি-বারিক জীবনের একটা দায়িত্ব আছে, তখনও দাদাকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে উত্তর দিলো না। বলল, এক জায়গায় গিয়ে পড়েছিলাম, সেখান থেকে খবর দেওয়ার উপায় ছিল না।···

এ তো ছোড়দার প্রকৃতিমতো নয়।

ব্যাপারটা কী হলো ছাই !

রুবি পিছনের দিনগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে করে ফেলল, হ্যাঁ ঠিক ! ঠিক সেদিন থেকেই। সেই যেদিন সেই লক্ষ্মীছাড়া বন্ধুটার সঙ্গে হুট করে বেরিয়ে গেল, আর সমস্ত দিন রাত্তির আমাদের দগ্ধে মেরে পরদিন কাক-তাড়ুয়ার মতো চেহারা নিয়ে ফিরল। সেই দিন থেকেই ছোড়দার স্বভাবটা পালটে গেছে।···মায়ের কাছে না-হয় না ফেরার কারণটা খুলে বলল না, আমার কাছে তো পরে বলবে একদিন, 'জানিস সেদিন কী হয়েছিল ?'

নাঃ, সে সব কিছু না। অথচ বেশ ধরা পড়ছে, কোথায় মন কোথায় মানুষ··· ভগবান জানেন পাজী বন্ধুটার প্ররোচনায় পড়ে কোনো বিপ্লবী পার্টি ফার্টিতে নাম লিখিয়ে এসে বসেছে কিনা।···বন্ধুবেশী শনির প্ররোচনায় পড়েই তো উচ্ছন্নে যায় মানুষ ! ভাবা পাপ, ছোড়দা সম্পর্কে একথা ভাব-ছেও না রুবি যে বন্ধুটা ছোড়দাকে ভুলিয়ে অন্য কোনো মন্দ জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল, তবু যে চেহারা নিয়ে এসেছিল তাতে সেই সন্দেহ আসাই স্বাভাবিক।···দাদাতে বৌদিতে কেমন যেন তাকাতাকিও করছিল।··· আর দাদা মাকে বলেছিল, থাক বেশী খোঁচাখুঁচি করতে যেও না, শেষে হয়তো কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবে।

হঠাৎ অকারণে চোখে জল এসে গেল রুবির।

বৌ এসে ছোড়দাকে বদলে দেবে ভেবে আগে থেকে মন খারাপ করছিল বেচারা, এখন তো বেশ বুঝছে, শুধু শুধুই বদলে গেল ছোড়দা।

মানুষ যদি হঠাৎ বদলে যায়, সে তো অচেনা জনেদের থেকেও অধিক অচেনা হয়ে যায়। তার মানে, রুবি তার চিরদিনের ছোড়দাকে হারিয়ে ফেলল।

কিন্তু অমিতা ?

অমিতা কি 'সর্বস্ব' হারিয়ে ফেললেন না ?

তাঁর এতদিনের লালিত স্বপ্ন, সাধ, আশা ?

বড় ছেলে ছেলেবেলা থেকেই ছিল কেমন আত্মকেন্দ্রিক 'স্বয়ং কর্তা' পরি-ণত মানুষ-সুলভ গম্ভীর। মায়ের সঙ্গে দূরত্ব তার বরাবরই। বড়লোকের

বাড়ির জামাই হয়ে সে দূরত্ব বাড়িয়েই ফেলেছে। কিন্তু ছোটটা চিরদিনই দাদার একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীত।...এখনো সে হঠাৎ হঠাৎ মায়ের কোলে মাথা রেখে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে, বলে, আচ্ছা মা তোমার মেজাজটি তো মন্দ নয়, কিন্তু গা-টা এত ঠাণ্ডা থাকে কিসে ?···

রুবির কাছে গল্প করে, ছেলেবেলায় জ্বর-টর হলে, কেমন হাঁ করে বসে থাকতো কতক্ষণে এসে গায়ে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাত বুলোবে মা।···খাওয়া নিয়ে আবদার করতে, রান্না পছন্দ না-হলে তাই নিয়ে ব্যাখানা করতে, যখন তখন মাকে ক্ষেপিয়ে মজা দেখতে এখনো তো বালকের মতো ছিল গৌতম।

অমিতার মনে পড়ছে যেদিন সেই ভোরবেলা বেরিয়ে গেল, তার আগের রাত্রে খেতে বসে গৌতম বলে উঠেছিল, আচ্ছা রুবি কবে যেন আমরা লাস্ট মাংস খেয়েছিলাম রে ? প্রাগৈতিহাসিক যুগে বোধহয়, তাই না ?

শুনে দ্বিজোত্তম হেসেছিলেন। বলেছিলেন, আমার তো বুধবারে ছাড়া বাজার যাওয়ার সময় হয় না, উত্তমও থাকে না, রবিবারে-টারে তুই নিজেই একবার চলে যাস না বাবা ?

নিজে ? বাজারে গিয়ে মাংস এনে ? কাঁচা মাংস ?

গৌতম বলেছিল, সাতজীবন মাংস না খাই ! বাজারে ঝোলানো কাঁচা মাংসর দিকে হঠাৎ চোখ পড়লে আমার গা বমি করে।

দ্বিজোত্তম বলেছিলেন, তাহলে আর কী করা ? তোদের মা তো আর কখনো মানুষ হলো না। এখন তো দেখি মহিলারাই বাজার-টাজার করে থাকে।···

এ কাঠামোয় আর হবে না।

বলে অমিতা কথায় যবনিকা টেনেছিলেন। তবু মনে ঠিক করে ফেলে-ছিলেন, পরদিন বাসনমাজা মেয়েটাকেই পয়সা দিয়ে বুঝিয়ে-টুঝিয়ে আনিয়ে নেবেন। রবিবার আছে। যদিও অমিতার সংসারে রবিবারটা পূর্ণাঙ্গ নয়, বাড়ির কর্তা অফিস যান, বড় ছেলে শ্বশুরবাড়ি, শুধু রুবি আর গৌতম। তবু তারা দু'জনেই দুশো। খেতে বসে যত হাসি গল্প।

সেই উৎস হঠাৎ যেন কোথায় কোনো বালির চড়ায় হারিয়ে গেছে আজ ক-দিন। বুধবার দিন তো আনলেন দ্বিজোত্তম ছোট ছেলের প্রিয় বস্তু, অমিতা বড় যত্নে রাঁধলেনও, কিন্তু ছেলে খেল যেন লাউকুমড়ো খাচ্ছে।···

শেষ অবধি অমিতা নিজে থেকেই বলে উঠলেন, কিরে মাংস ভালো হয় নি?

ছেলে বলল, কেন? কে বললে? ভালো হয়েছে তো!

অথচ ক'দিন আগে হলেও, ওই প্রশ্নটা নিয়ে ঠাট্টার চোটে মাকে কোণ-ঠাসা করে ছাড়ত সে। রুবিকে, দাদাকে, বাপকে, ডেকে ডেকে বলতো, প্রশংসা শোনার জন্যেই মা এমন নেতিবাচক প্রশ্ন করে। অতএব আমাদের উচিত, খেতে বসেই সকলে এক একখানি ঢালাও প্রশংসাপত্র পেশ করা।···

অতঃপর হয়তো বলতে শুরু করতো, 'উঃ দুধটা আজ কী দারুণ রান্না হয়েছে দেখছিস রুবি?···জলটাও দেখ কী টেস্টফুল।'

সেই সদা আনন্দময় ছেলের মুখ থেকে যেন আনন্দ আহ্লাদের চিহ্ন মুছে গেছে।···যেটুকু দেখায়, সেটা যে নেহাৎ দেখানোই তা বোঝা যায়।···

অমিতা ভেবে ঠিক করেছিলেন, হয়তো ছেলেটার বিয়ের মনটা বেশী হওয়াতেই! কনে বাছাই করে করে অমিতা দেরীও করে ফেলেছেন সত্যি। নাঃ আর বেশী বাছাবাছি করবেন না, এবার যে সম্বন্ধটি এসেছে, শুনেছেন না কি মেয়ে সুন্দর, সেখানেই ঠিক করে ফেলবেন।···সেই সংকল্প নিয়েই আজকের কনে দেখতে যাওয়ার তোড়জোড়।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হঠাৎ ছেলের আদেশ হলো এসব কনে দেখা-টেখা বন্ধ করে দেওয়া হোক।

এখন অমিতা মাথা খুঁড়বেন, না পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসবেন? আজ না-হয় বলে পাঠানো হলো ছেলের মা'র হঠাৎ শরীর খারাপ—কিন্তু পরে?

বড় ছেলের বৌ কথা কম কয়, কিন্তু দামী কথা কয়। হঠাৎ একটি রক্ত হিম করা দামী কথা বলে বসল সে। সেও তো কনে দেখতে যাবার প্রস্তুতি করছিল, সে প্রস্তুতি থামিয়ে ফেলে বলল, আচমকা এমন উল্টো পাল্টা

কথা বলবার মতো ছেলে তো নয় ছোড়দা, (ছোড়দাই বলে সে আজি-কালের মতো ঠাকুরপো বলতে পারে না।) 'কারণ' কিছু একটা আছেই। এমনও হতে পারে হঠাৎ ভিতরে কোনো অসুখ-টসুখ টের পেয়েছে—

অমিতা বৌকে প্রায় মারতেই উঠেছিলেন, অসুখ মানে ?

বৌ বলল, অসুখ মানে অসুখই। আর কি মানে হবে মা ?···বড় হয়েছে, হয়তো শরীরের মধ্যে কোনো অসুবিধে ফীল করে নিজেই ডাক্তার-টাক্তার দেখিয়েছে—

অমিতা আরো ক্রুদ্ধ হলেন, তুমি কী ভেবে কী বলছ বলো তো শোভা ? অমন নীরোগ শরীর আমার গৌতমের।

শোভা শান্ত গলায় বলল, কিছু ভেবেই বলি নি মা। মনে হচ্ছে এমন হঠাৎ বিয়ের আপত্তি, কারণ তো একটা থাকবেই। অসুখের কথা কি বলা যায় ? কত সুন্দর স্বাস্থ্যবান শরীরের মধ্যেও কত সময়—তলায় তলায় রোগ বাসা বাঁধে।

রুবি বলল, তুমি থামো বৌদি। দেখছ মা মরছে।

বৌদি বলল, ঠিক আছে, থামছি। তোমাদের বাড়িতে তো থেমেই আছি ভাই।···

চলে গেল নিজের ঘরে। কিন্তু অমিতার রক্ত তো ঠাণ্ডা করে দিয়ে গেল।··· হে ভগবান, সত্যিই তেমন কিছু নয় তো ? তাই ছেলে অমন মনমরা, চিন্তা-যুক্ত ! হে ঠাকুর ওই সববিষয়ে পাকা চোকা বৌটার কথা যেন সত্যি না হয়।···যেন মিথ্যে হয় মিথ্যে হয়, মিথ্যে হয়।

ঠুক ঠুক ঠুক।

সেই একটানা শব্দ !

নিত্যদিনের আরতির ঘণ্টাধ্বনি !

টুনু দাওয়ায় বসে চিত্তর একটা জামার বোতাম বসাচ্ছিল, উঠে এলো এদিকে। বলল, আর কতকাল এসব চালাবি পঞ্চু ? এবার ছাড়। আর

তো তোর ওই 'অক্ত' খাওয়া যাচ্ছে না। শিলের মতো একটুকরো বড় পাথর, আর একটুখানি ডেলা পাথর এই পঞ্চুর কবিরাজী পাঁচন প্রস্তুতের উপকরণ। পঞ্চু সেইটার ওপর হাত রেখেই, বিরক্ত গলায় বলল, কেন? এটুকুতে তোমার জিবে কী ফোস্কা পড়তেছে শুনি? দু ঝিনুক অস, ঝপ করে গলার মধ্যে ঢেলে নেওয়া, এই তো!

টুনু হেসে ফেলে বলল, হ্যাঁ, এই তো। যা বিচ্ছিরি খেতে নিজে খেতে হলে বুঝতিস!

কিন্তু সত্যিই কি আর টুনু স্বাদের প্রশ্নে জিনিসটা ত্যাগ করতে চাইছে? এ কি আসানসোলের টুনু?···তা নয় আসলে ছেলেটার এই প্রতিদিনকার বৃথাশ্রম, পীড়িত করছে টুনুকে। তবে সেই আসল কথাটা বলে তো আর নিবৃত্ত করা যাবে না ওকে। তাই বিস্বাদের ছুতো দেখানো।

কিন্তু পঞ্চু শক্ত ছেলে।

শক্ত ছেলে না হলে, হাওয়ায় উড়ে বেড়ানো শুকনো পাতার জীবন থেকে, এমনভাবে পায়ের তলায় একটা শক্ত বেদী গড়ে নিতে পারে? এখন তো ও টুনুর কাছে অ আ ক খ শিখতে শুরু করেছে। টুনু বলে বই পেলে ওকে দুদিনেই 'প্রথমভাগ' শেষ করিয়ে ফেলা যেত।

যদিও টুনু যখন প্রথম শেখাতে ডেকেছিল, তখন পঞ্চু বলেছিল, এবার মাট্ থেকে ছাগলটা বাচুরটা টেনে এনে পড়া শেকাও। সেও যা এও তা। য্যাত্তোসব পাগুলে কতা।

কিন্তু টুনু বোঝে শেখার ইচ্ছে পঞ্চুর ষোলো আনা। মনে হয়, বুঝিবা ওই অক্ষরগুলোর মধ্যেই পঞ্চু তার পশ্চাদপটহীন ধূসর জীবনের রহস্য আবিষ্কারের পথ খুঁজে পাবার আশা রাখে।

তা আশা অনেকেই রাখে পঞ্চু, আশা রাখে একটু একটু করে মাটি ছেলে পঞ্চু এই ঘর দু'খানা আচ্ছা করে মজবুত করে ফেলবে, আশা রাখে, যে-টুকু উঠোন আছে, তাতে শাকপাতা লাউ-কুমড়ো উচ্ছে-বেগুন ফলিয়ে রান্নাঘরে সমৃদ্ধি আনবে, আশা রাখে কোনো চাষীবাসীর ঘর থেকে তুতিয়ে পাতিয়ে সামান্য দামে একটা 'নঈ বাছুর' কিনে এনে, তাকে 'পেলে পুষে

মানুষটি' করে দিদিকে খাঁটি দুধ খাওয়াবে, আর আশা রাখে এই ডুমুরের রস খাইয়ে খাইয়ে দিদির গায়ে তাজারক্তের সঞ্চার করবে।

এখনই অলক্ষ্য থেকে দেখে, আর ভাবে, কাজ হয়েচে বৈকি! কিচু কাজ হয়েছে। আগের মতো আর আদো-ঘুমন্ত ভাব নাই দিদির। চলনে বলনে জেল্লা এয়েচে। আরো কিছুকাল খেলেই আর চেরকাল নেয়ম করে খেলেইবা দোষটা কী?

এই বিশ্বাস আর আশার মূলে কুঠারাঘাত করে দিদি বলে কিনা আর পারা যায় না, ছেড়ে দে! তোকে খেতে হলে বুজতিস!

পঞ্চু আবার পাথরটা হাতে তুলে নিয়ে বেজার গলায় বলল, বুজতে আবার বাকি আচে না কি পঞ্চার? আগে না খেয়ে তোমায় দেচে না কি? কেমন খেতে, বিষ না কি বুজে দেকে নি?

টুনু কয়েক সেকেণ্ড ওর দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে থেকে আস্তে বলে, বুঝলাম। তাহলে আর আমার পরিত্রাণ নেই কী বলিস?

না নাই! অ্যাখোন যাও তো তুমি? কাজের সোময় দিক করতে এসো নি।

টুনু সরে আসে। ছুঁচসুতো বোতাম জামা সব ঠেলে সরিয়ে রেখে চুপচাপ বসে থাকে।

বেলা ঠিক কত জানা যাচ্ছে না।

ঘড়ি বলতে চিত্তর হাতঘড়ি, সেটা চিত্তর কব্জিতে বাঁধা হয়ে এখন 'নজরপুর' স্টেশনে বেড়াচ্ছে।

এই এক রোগ হয়েছে চিত্তর, প্রায় প্রায় নজরপুর রেল স্টেশনে গিয়ে নজর বুলিয়ে আসা। বলে, 'এমনি যাই।' কিন্তু টুনু জানে কিসের আশায় যায়। চিত্ত আশা করে সেই গৌতম নামের ছেলেটা হঠাৎ একদিন এসে পড়বে। সেই এসে পড়ার পিছনে আর কোনো আশা লুকোনো আছে তা অবশ্য টুনু জানে না, জানবার কথাও নয়। টুনু তবু চিত্তর বৃথা আশা দেখে হতাশ হয়, দুঃখিত হয়। ভাবে—দৈবাৎ তুমি একবার টেনে নিয়ে এসেছিলে বলেই, লোকটা এই এত ক্লেশ স্বীকার করে আবার এখানে আসতে

যাবে ? কিসের টানে ? কিসের দায়ে ? তোমার মতো পাগল তো সবাই নয়। তুমি একটা পুরো পাগল !

কিন্তু চিত্তকে শুধু 'পাগল' বলে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকাই কি টুনুর পক্ষে সম্ভব ? অহরহ একটা কাঁটার যন্ত্রণা টুনুকে যে তিষ্ঠোতে দেয় না। চিত্তকে মুক্তি দেবার কোনো উপায় টুনুর হাতে আছে ?

যদি শুধু দয়া, শুধু করুণা, শুধু সম্পর্কের বন্ধনের একটা দায়িত্ব চিত্তকে এখানে বেঁধে রাখতো—হয়তো মুক্তি দেবার প্রশ্ন উঠতো না। ধীরে ধীরে এ-ব্যবস্থা করে দিতে বলতো চিত্ত টাকা ব্যতীত তো কিছুই হবার উপায় নেই, তাই লজ্জার মাথা খেয়ে বলছি, আর আমায় নিয়ে ভুগো না তুমি, শুধু মাসে মাসে নিয়মিত কিছু করে টাকা আমায় পাঠিয়ে দিও।···পঞ্চু বেশ ম্যানেজ করতে পারবে।···কানপুরের চাকরিটা নিয়ে চলে যাও তাড়াতাড়ি।···'ভালো চাকরি' তো তোমার উঠোনের গাছের কাঁচালঙ্কা নয় যে যখন ইচ্ছে হবে পেড়ে নেবে।

কিন্তু চিত্তকে বেঁধে রেখেছে কি শুধু মায়াদয়া করুণা? শুধু খসে পড়া সম্পর্ক বন্ধনের দায়িত্বের জের ? সে সম্পর্কের জের তো টুনু নিজেই মিটিয়ে দিয়েছে 'বৌদি' ডাকটা বাতিল করে দিয়ে।

তবু চিত্ত এখানে পড়ে আছে।

চলে যাবার ক্ষমতা নেই বলেই পড়ে আছে !

মৃত ব্যক্তি কি চলে যেতে পারে ?

চিত্ত ভালবাসায় মরে আছে।···সে নিজে সেটা বোঝে কিনা জানে না টুনু, কিন্তু টুনু জানে—সেই 'মায়াদয়া করুণা, আত্মীয় বন্ধনের দায়িত্ব' এগুলো এখন বাক্সয় পড়ে থাকা একটা উইধরে যাওয়া দলিল। তাকিয়ে দেখলে মনে হবে আস্ত, কিন্তু হাতে তুলে দেখতে গেলেই ঝুরঝুরিয়ে ঝরে পড়বে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে।

টুনু জানে, অনেকদিন ধরেই জানে।

টুনু বোঝে, গোড়া থেকেই বোঝে।

তবু যখন একদিন চিত্ত কথার কথার মতো ভাবে বলে উঠেছিল, 'তুরশালা,

দোষ না করেও মিথ্যে বদনাম। তবে আর বদনামটা সত্যি করে তুললেই বা লোকসান কী? সবাই যখন ধরেই নিয়েছে চিত্তশালা পরের বৌ নিয়ে ভেগে বসে আছে, তখন চল তোমায় নিয়ে সত্যিই ভেগে পড়ি। কানপুরে ভালো চাকরির অফার পাচ্ছি, কোয়ার্টার্স মিলবে, কেন বোকার মতো এখানে পড়ে থাকা? সেখানে কে চিনবে আমাদের?'...তখন যেন টুনু একটা চাবুক খেয়েছিল। কাঁটার চাবুক।

তার মানে শেষবেশ সেই চিরাচরিত পন্থা?

নারী-পুরুষে সখ্য সম্পর্কের সেই আদি অন্তকালের অমোঘ পরিণতি? জগতের আর কাউকে মুখ দেখাক্ না দেখাক্ নিজের কাছে নিজে মুখ দেখাবে কী করে?

লজ্জায় আর বেদনায় টুনুর মুখটা বিকৃত হয়ে গেলেও তার সঙ্গে একটা তিক্ত বিদ্রূপের হাসির আভাসও ফুটে উঠলো। বলল, তার মানে শেষ পর্যন্ত সেই হার স্বীকার?

চিত্ত বলল, জিৎলেই বা বুঝছে কোন্ শালা?

নিজের চুলের মুঠিটা চেপে ধরে নিজেই জোরে জোরে ঝাঁকাল চিত্ত যেন আর কারো চুল ধরে মাথাটা দেয়ালে ঠুকে দিচ্ছে।

টুনু সেদিকে চেয়ে একটু হেসে ফেলে, আস্তে বলল, নিজের মনের মধ্যে যে এক 'শালা' বসে আছে, সে তো বুঝবে?

চিত্ত যেন একটু নিভে গেল।

উঠোনে নেমে খানিকটা পায়চারী করে নিল, তারপর বলল, বেশ তাহলে এইভাবেই চলুক।

টুনু বলল, আমার তো বেশ চলেই যাচ্ছে, তোমার পক্ষে যে অচল অবস্থা। এবার তুমি আমার দায় থেকে মুক্ত হও চিত্ত।

চিত্ত প্রায় খিঁচিয়ে উঠে বলল, তোমার সৌভাগ্য আর সুবিবেচনার জন্যে ধন্যবাদ।

এটা বেশ কিছুদিন আগের কথা।

তারপরে এ নিয়ে আর কোনো কথা হয় নি। শুধু দেখা যাচ্ছিল ক্রমেই

যেন অবসাদগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে টুনু, যা ছিল তার থেকেও বেশী। টুনু যেন শুধু চোখ বুজে পড়ে থাকতে পেলেই বেঁচে যায়, টুনুর জীবনে এছাড়া আর কোনো কাম্য নেই।

তারপর একদিন অবসন্নতার চরম অবস্থায় পৌঁছে চৈতন্য হারিয়ে বসল টুনু। ডাক্তারের প্রশ্ন নেই, ওষুধের বিলাসিতা নেই, সারারাত মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে বসে রইল চিত্ত, আর অনুধাবন করতে চেষ্টা করল, এই সব গভীর গণ্ডগ্রামের লক্ষ লক্ষ মানুষ কেমনভাবে তাদের মৃত্যু ব্যাধি কবলিত প্রিয়জনেদের দেহ কোলে নিয়ে বসে থাকে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে।

কিন্তু মারা গেল না টুনু নামের দুর্ভাগিনী মেয়েটা। পরদিন চোখ মেলে ধিক্কারের হাসি হেসে বলল, দুঃখীরা মরে, এ তুমি কোথাও দেখেছ চিত্ত? বৃথাই তুমি রাত জেগে বসে কষ্ট পেলে! নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোলেও ঘুম থেকে উঠে ঠিক দেখতে উঠে বসে আছি।

তার কদিন পরেই গৌতম এলো।

রোদে ঝলসে ঘেমে মাঠ পার হয়ে এসে চিত্ত হাতের থলিটা দাওয়ায় নামিয়ে ক্লান্ত গলায় ডেকে বলল, পঞ্চু, এগুলো তুলে রাখ।

পঞ্চু বেরিয়ে এলো রান্নার চালার পিছন থেকে। এর মধ্যে কি আছে তার অজানা নেই। দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ন্যূনতম কিছু রসদ।

টুনু ঘরের মধ্যে বসে পঞ্চুর জন্যে কিছু 'টাস্ক' তৈরী করছিল। একটা শ্লেটপেনসিল কিনে আনা হয়েছে পঞ্চুর জন্যে, সেটাতেই লিখে আর মুছে, মুছে আর লিখে, চালানো হচ্ছে।

চিত্তর সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এসে আর কোনো কথা না বলে, খুব সহজভাবে বলল, আমি বলি কি, তুমি এবার একটা হালবলদ কিনে ফেল।

চিত্ত চমকাল, কী কিনে ফেলব?

হালবলদ! এখন তোমায় যা মানাবে।

চিত্ত একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে গায়ের জামাটা খুলে ফেলে সেইটা ঘুরিয়েই হাওয়া খেতে লাগল।···হাওয়া বইছে, কিন্তু আগুনের হলকাবাহী।

পঞ্চু এসে দাঁড়াল।

পঞ্চুর মুখে রাগের রেখা।

পঞ্চু কথা বলল, অভিযোগের গলায়, আজও তো দেকতেচি মাচ আনো নাই। নিত্যদিন বলে বলে মুক ব্যাতা হয়ে গেল। একদিন দুটো আনতে নাই? হাট ছেল তো আজ!

মাচ!

চিত্ত তার ভিতরের জ্বালাটা এই ছেলেটার উপরই ঢাললো, শখ কত! মাছ খাবে। মাছ খেতে হলে, স্বপ্নে খাস।

পঞ্চুর চোখে একটুকরো আগুন ঝিলিক দিয়ে উঠলো, পঞ্চার খাবার জন্যে বলা হতেচে, কেমন?···একটা উগীমানুষ নিত্যদিন ছাইপাঁশ খেয়ে মুখে অরুচি—

পঞ্চু!

টুনুর তীব্র কণ্ঠের শাসনসূচক সম্বোধনে পঞ্চু পত্রপাঠ অদৃশ্য হয়ে গেল। টুনু জানেও এখন অলক্ষ্যে বসে চোখ মুছবে। কিন্তু ওর ভালবাসার এমন তীব্র প্রকাশকে প্রশ্রয় দেবে কেমন করে টুনু?

টুনু আস্তে চিত্তর কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। বলে, ক্রমশ বুঝছি, মল্লিক সাহেবের পরামর্শটাই ঠিক ছিল। তুমি আমার জন্যে একটা ওই 'হোম ফোম' যোগাড় করে ফেল।

চিত্তর মুখে একটু বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠলো।

বলল, হোম? হ্যাঁ সেই যোগাড়ই হচ্ছে।

টুনু বলল, উড়িয়ে দিয়ে লাভ নেই। তুমি যে ক্রমশই 'ছোট' হয়ে যাবে। এ আমি সহ্য করতে রাজী নই।

চিত্ত তেমনি ব্যঙ্গের গলায় বলল, আধখানা বাদ দিয়ে বলার দরকার নেই, বল যে 'ছোটলোক হয়ে যাচ্ছ।' কিন্তু নতুন করে হয়ে যাবার কথা তো ওঠে না। চিত্ততোষ চৌধুরী তো চিরকালের ছোটলোক।

টুনু একটু হাসল, বলল, ও নিয়ে তর্ক করতে যাব না, বেশী কথা আমার আসে না। বলতে চাইছি তোমার সেই কানপুরের চাকরিটার কি এখনো

আর আদায় আছে ?

চিত্তর কপালটা কুঁচকে গেল, কেন ? সে খবরে তোমার কী দরকার ?

আছে দরকার। শুনি একবার।

চিত্ত অগ্রাহ্যের গলায় বলল, চাকরি তো রাস্তায় পড়ে থাকা ঢিল পাটকেল নয় যে, যেমন ছিল তেমনি—পড়েই থাকবে !

সেই আশঙ্কাই করছিলাম ! টুনু বলল ঠিক আছে। এখন আমার— অনুরোধ বলো অনুরোধ, আদেশ বলো আদেশ, উঠেপড়ে লেগে আবার খোঁজো কলকাতার বাইরে কোনো চাকরি। যত তাড়াতাড়ি পারো।

চিত্তর মুখের উপর দিয়ে যেন একটা আলোছায়ার খেলা খেলে যায়। টুনু ওদিকে তাকিয়ে থাকতে পারে না, চোখ ফেরায়।

চিত্ত বলল, বেগম সাহেবার আদেশ ! যো হুকুম। কিন্তু কলকাতার বাইরে কেন ?

আমি তাই চাই।

চিত্তর মুখের ওপর কে যেন একটা নানারঙের আলোক সম্পাত করে চলেছে। চিত্তর গলার স্বরেও তার রেশ।

বলল, বেশ, খুঁজলাম। পেলামও। তারপর ?

তারপর আবার কী ? সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে, ভালো জামা জুতো পরে রওনা।

তারপর ?

তারপর ? তারপর নিজেকে ঘানিতে জুড়ে ফেলে ঘুরে চলা।

চিত্ত বলল, বেশ ধরে নাও জুড়ে নিয়েছি, ঘুরছি। ঘুরে চলছি। কিন্তু তারপর ?

টুনু একটুক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, যত চেষ্টাই কর, আমায় তুমি রাগিয়ে দিতে পারবে না। একটা পেত্নীর দায় যখন ঘাড়ে নিয়েছ, তখন চিরদিনই তাকে বয়ে চলতে হবে। জ্যান্ত পেত্নী তবু কখনো কোনোদিন মরে রেহাই দেয়। মড়া পেত্নী তো সে রেহাইও দেয় না। অতএব—

কী হলো? থামলে কেন? রাগিয়ে দিতে আমাকেও পারবে না। যা বলতে চাও বলে যাও।

টুনু বলল, কিন্তু এখন না হয় থাক। অনেক বেলা হয়ে গেছে, চান হয় নি!

ঠিক আছে, ঠিক আছে। চান করিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করিয়ে বলতে হবে, এমন কোনো কারণ নেই। যা বলছিলে শেষ করে ফেল।

টুনু হাসলো।

বলল, বললাম তো, শেষ নেই। এ দায় অশেষ। যাক বলছি—'হোম' বলো আশ্রম বলো, যেখানেই রাখো টাকার দরকার। নিয়মিত কিছু পাঠাতেই হবে নিশ্চয়। অতএব তোমার একটা নিয়মিত আয়ের দরকার।···আর কলকাতার বাইরে কেন জানো?···এদিকটা ছাড়া হয়ে গেলে সর্বদা আর চোখের সামনে পেত্নীর ছায়া ঝুলে থাকবে না।

হুঁ। সবদিকেই বেশ পাকা হয়ে উঠেছ দেখছি।

চিত্তর মুখের রেখায় অসহিষ্ণুতা।

টুনু বলল, তা হচ্ছি হয়তো। সংসারের সার সত্য কথাটা জেনে ফেললে এই রকমই হয়। দেখছি সার সত্য হচ্ছে টাকা। যেখান থেকে হোক ওইটা সাপ্লাই করতে পারলেই দেখবে ঠিক টিঁকে আছি।

চিত্ত হাতের জামাটাকে ছুঁড়ে একদিকে ফেলে দিয়ে, বলে ওঠে, ওঃ শুধু টাকা? আর কিছু না হলেও চলে?

টুনু অদ্ভুত একটা শানানো গলায় বলে, বলতে গেলে তাই। টাকাই সবের তো চালক। সবকিছু, সকল কিছুই চালিয়ে নেওয়া যায়, ওটা থাকলে। তোমার এই পঞ্চুর 'হোমে'ও যদি আমায় রেখে যাও, আর মাসে মাসে ভালোমতো টাকা পাঠাও দেখবে দিব্যি চালিয়ে চলেছি।

টুনু মনে মনে আউড়ে যায়, বড় বেশী নিষ্ঠুরতা হয়ে যাচ্ছে না কি টুনু? কিন্তু উপায় কী? লোকটাকে তো বাঁচাতে হবে?···ছেলেবেলায় ছোট-কাকা একটা গান গাইত, ঘুরে ফিরে একটা লাইন গেয়ে চলত, 'বাঁচাও তাহারে মরিয়া।'···টুনু রেগে রেগে বলত, ছোট্‌কা এমন ভুল ভুল গান

গাইছ কেন ? 'মারা' মানে তো মেরে ফেলা। মেরে ফেলা আবার বাঁচানো যায় ? ছোট্কা বলত, 'মেরে ফেলে বাঁচানোর কথা তো বলা হয় নি, বলছি —বাঁচাবার জন্যে মারা যায়।'

সেই শিক্ষাটাকে এখন কাজে লাগাচ্ছে টুনু।

কিন্তু কাজে কি লাগল ?

চিত্ত বলে উঠলো, অন্য কোনো হোম-টোমের দরকার হবে না, পঞ্চুর— হোমেরও না। পাকা হোমের ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে। এই যে—

বলে প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একখানা খামের চিঠি টেনে বার করে ফেলল। প্যাণ্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখার জন্যেই বোধহয় এমন দুমড়ে মুচড়ে গেছে চিঠিটা।

সেই মোচড়ানো চিঠিখানা টুনুর পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল চিত্ত, পড়তে পারো।

খামের উপরে চিত্তর নাম। অচেনা হাতের লেখা।

টুনু কুড়িয়ে নিল না, বলল, পরের চিঠি আমি পড়ি না।

চিত্ত বলল, উপলক্ষটা আমি, লক্ষ্যটা তুমি!

মানে ?

টুনুর মুখটা লাল দেখাল।

চিত্ত বলল,

পড়ে দেখলেই মানে বুঝতে পারবে।

আমার দরকার নেই। অচেনা লোকের লেখা চিঠি পড়তে যাব কেন।

টুনু ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

চিত্ত তার পিছনে উত্তরটা যেন ছুঁড়ে দেয়, হাতের লেখাটা অচেনা, লোকটা নয়। চেনা, খুব চেনা, আরো চেনা হয়ে যাবে।...

অমিতা স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন। পাথরের মতো।

অমিতার এ এক অপরিচিত রূপ।

রাগ দুঃখ আহ্লাদ আনন্দ, যা কিছুই মনের মধ্যে ঢেউ তুলুক, অনর্গল

কথা কয়ে যাওয়াই স্বভাব অমিতার। অমিতা কি সহসা দুঃসহ কোনো শোকের আঘাতে এমন পাথর হয়ে গেছেন?

কিন্তু না, তেমন কোনো ঘটনা ঘটে নি অমিতার জীবনে। তবু অমিতাকে দেখে মনে হচ্ছে পরাজিত সর্বস্বান্ত নিঃস্ব।

অমিতা 'মনে মনে' কথা বলতেও ভুলে গেছেন। সামনে শ্রোতা না পেলে অমিতা তো মনে মনেও কথার চাষ চালিয়ে যান আর ক্রমশ সেটা আর মনে মনে থাকে না। যার জন্যে তার বড় বউ শোভা আড়ালে বরকে বলে, পরে দেখে নিও আমার কথা! নিশ্চয়ই তোমার মার মাথার কিছু গণ্ডগোল হয়েছে।···তা নইলে কখনো মানুষ একা একা কথা কয়?

কিন্তু এখন অমিতার বুঝি বাইরের মুখের মতো মনের মুখটাও মূক হয়ে গেছে।

একদিন অমিতা তাঁর বড় বৌমার রক্তহিম করা একটি মন্তব্যে রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিলেন, এবং স্বামীপুত্র কারুর কাছেই সেই আগুনের জ্বালা প্রকাশ করার উপায় নেই বলে সরবে স্বগতোক্তি চালিয়ে গিয়েছিলেন, যতক্ষণ না রুবি কাছে এসে বলেছিল, দোহাই তোমার মা, এইবার একটু ক্ষ্যামা দেবে? যাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছো সে তো মুখে বই আড়াল দিয়ে হাসছে—ততক্ষণ চুপ করেন নি।

রুবির কথায় হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিলেন।

কিন্তু আজ তো পরের মেয়ের ধৃষ্ট মন্তব্য মাত্র নয়। আজ অমিতাকে যে আঘাত পাথর করে দিয়েছে, সেটা এসেছে তাঁরই প্রাণতুল্যর কাছ থেকে।···অকস্মাৎ অতর্কিতে মার বুকে একখানা পাথরে চাঁই ছুঁড়ে মেরেছে অমিতার ছোট ছেলে।

অমিতার তিলতিল করে গড়ে তোলা আশার প্রাসাদখানা যেন এক-ফুঁইয়ে ধূলিসাৎ করে দিলো গৌতম। অমিতার বিশ্বাস দৃঢ় ছিল, এই ছেলে তার দাদার মতো স্ত্রী বশম্বদ হবে না, অমিতা ওপক্ষকে বুঝিয়ে ছাড়বেন কাকে বলে, সভ্যতা, শালীনতা, নম্রতা বাধ্যতা। আর কাকে বলে পারিবারিক বন্ধন।

মা বাপকে মাথায় রেখেও যে বৌকে ভালবাসা যায়, সংসারে আনন্দ আহ্লাদের হাওয়া বহানো যায়, 'মায়ের ছেলেটি' থেকেও স্ত্রীর 'স্বামী' হওয়া যায়, এসব গৌতম তার দাদাকে বুঝিয়ে দেবে, দেখিয়ে দেবে।

কে ভেবেছিল সেই গৌতম তার মায়ের প্রত্যাশাভরা বুকের গভীরে বসিয়ে দেবার জন্যে বিষের ছুরি শাণাচ্ছে।

মা, বাবা অফিস থেকে ফিরেছেন।

রুবি বলল এসে।

অমিতা চোখ তুলে তাকালেন। নির্লিপ্ত গলায় বললেন, এসেছেন, চা-টা দাওগে।

এটাও অমিতার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। যেখানে যত কাজেই থাকুন, দ্বিজোত্তম ফিরলেই ঠিক চায়ের ব্যবস্থাটির মধ্যে এসে ঢুকে পড়েন।···আড়ালে বৌ হাসে, মেয়েও হাসে। আবার কখনো কখনো রেগে উঠে বলে, আমি তো দিচ্ছিলাম। তুমি আবার কেন রাঁধতে রাঁধতে, হাঁপাতে হাঁপাতে এলে?

অমিতা কুণ্ঠিত হাসি হাসেন, না, এই আর কি—সেই কোন্ ভোরে বেরিয়ে যাওয়া, সারাদিনের পর তেতেপুড়ে আসা—

দ্বিজোত্তম কৌতুকের হাসি হেসে বলেন, ওরে! আসলে তোদের মা হিন্দু-নারীর কর্তব্যের পরাকাষ্ঠা দেখাতে চায়।

অমিতা রেগে ওঠেন, কিন্তু অভ্যাসটি ত্যাগ করতে চান না। আজ ব্যতিক্রম।

আর আজই রুবি বলে উঠলো, না বাপু তুমিই যাও। ছোড়দার কথাটাও তো বলতে হবে।

অমিতার অনভ্যস্ত স্তব্ধতার বাঁধ ভাঙে। তীব্র তীক্ষ্ণ গলায় বলে ওঠেন, কেন? আমায় বলতে হবে কেন? যার কথা সেই বলবে। যদি মায়ের বুকে হাতুড়ি বসাতে পেরেছে, তো বাপের বুকেই বা পারবে না কেন?

রুবি ঠোঁট কামড়াল।

রুবি মায়ের ওই আশাভঙ্গে ক্ষিপ্ত উত্তেজিত মূর্তির দিকে তাকিয়ে দেখে

শান্তগলায় বলল, পাগলামী করে লাভ কী ? দেখোগে পরামর্শ করে, কী ভাবে আটকানো যায় ব্যাপারটা।

আটকানো।

অমিতা চমকে তাকালেন।

এ সম্ভাবনাও এখনো আছে তাহলে ?

ছেলের ঘোষণা শুনেই তো একেবারে হাত পা ছেড়ে দিয়ে পাথর হয়ে বসে পড়েছিলেন। আটকানোর কথা উঠতে পারে তাহলে এখনো ?

তবু বললেন, আটকানো আর গেছে।

রুবি ঝঙ্কার দিয়ে বলল, যাবে না তো কি একেবারে একঘায়ে বলিদান হয়ে যেতে হবে ? বাবার বুদ্ধি বিবেচনা পারসোন্যালিটি, ভালো মন্দ বুঝিয়ে দেবার ক্ষমতা, এগুলো কি কোনো কাজে লাগবে না ?

অমিতা বললেন, ভগবান জানেন।

তবু উঠলেন।

রুবি, বলল, হঠাৎ হৈচৈ করে বোসো না বাপু, ধীরে সুস্থে গুছিয়ে বোলো। জানো তো সেদিন বাবার 'প্রেসার' ধরা পড়েছে। তোমার তো জ্ঞান থাকে না এসব।

দুঃখে অভিমানে এতক্ষণকার শুকনো চোখে জল এলো অমিতার। ভগবান এমন ওঁচা করেই অমিতাকে গড়েছিলেন ! তাঁর জন্যে কারুর কোনো ভয় করার নেই।···অনায়াসে অবলীলায় মাথায় হাতুড়ী বসিয়ে দেওয়া যায়, বুকে পাথর ছুঁড়ে মারা যায়।···বড় ছেলে আলাদা ফ্ল্যাট কিনছে, সেটা বাপকে বলতে পারে নি, মাকে জানিয়ে রেখেছে, সময় বুঝে বাবাকে জানাতে।···কারণ ? কারণ হঠাৎ শুনতে পেলে বাবা শক্ খেতে পারেন।···

অমিতাও সেই ভেবে স্বামীকে চটকরে জানাতে বসতে যান নি।···অথচ ভিতরে ভিতরে স্বামীর প্রতি অদ্ভুত একটা ঈর্ষা বোধ করেছেন। আর এখন ছোট ছেলের বেলায়—

হ্যাঁ, মেয়ের সাবধানবাণীতে সেই ঈর্ষাটাই তীক্ষ্ণ দাঁত বসিয়ে দিলে। অমি-

তার কিছুই হয় না? অমিতার স্নায়ুরা ইস্পাত দিয়ে তৈরী? অমিতার হৃদযন্ত্র বজ্র দিয়ে গড়া?

রাগে ক্ষোভে দুঃখে আক্রোশে সাবধানবাণীতে পরোয়া করলেন না অমিতা। স্বামীর কাছে গিয়ে ফেটে পড়লেন,···'তোমার ছোট ছেলের বিয়ের আপত্তির কারণ এবার জানা গেছে।'

দ্বিজোত্তম থতমত খেলেন।

কী হলো? ব্যাপারটা কী?

অমিতা অনেক কথা বলে গেলেন, উথলে উথলে কাঁদলেন, এলো-মেলো ভঙ্গিতে বক্তব্য পেশ করলেন, তবু তার মধ্যে থেকে একটুকু আবিষ্কার করতে সমর্থ হলেন দ্বিজোত্তম, গৌতম আঁস্তাকুড় থেকে পাওয়া একটা মেয়েকে বিয়ে করবে বলে ঘোষণা করেছে।

আঁস্তাকুড়?

তা তাছাড়া আবার কী, আঁস্তাকুড়ের জঞ্জাল কুড়িয়ে এনে ঘরে তোলার বায়না।

যে মেয়েকে গুণ্ডা ধরে নিয়ে গিয়ে দু'চারদিন পরে আধমরা অবস্থায় ফেরত দিয়ে গিয়েছিল, আর তাই দেখে স্বামী ঘেন্নায় তার ঘরে উঠতে দেয় নি, পরিত্যাগ করেছে, এবং অতঃপর কতদিন যাবৎ কলকাতার বাইরে কোন্ চুলোয় যেন গৌতমের সেই লক্ষ্মীছাড়া বন্ধুটার সঙ্গে ঘর করছে, সে মেয়েকে আঁস্তাকুড়ের জঞ্জাল না বলে কি দেবমন্দিরে পুজোর ফুল বলবেন অমিতা?

লক্ষ্মীছাড়া বন্ধুটা এখন বোধহয় ওই বোঝাকে ঘাড় থেকে নামাতে চায়, তাই দ্বিজোত্তমের নির্বোধ ছেলেটাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে, তার গলায় গেঁথে দেবার ব্যবস্থা করছে।

কান্নাকাটির মধ্যেই আবার অমিতা তেজালো গলায় বললেন, দ্বিজোত্তম তাঁর পবিত্র বংশমর্যাদার কথা স্মরণ করুন, ভাবুন ছেলের খেয়ালকে প্রশ্রয় দিলে দ্বিজোত্তমের কুলগৌরব কোন্ ধুলোয় লুটোবে! ভেবে দেখুন বংশের মর্যাদা দ্বিজোত্তমেরই পিতৃবংশের না অমিতার?

আচ্ছা অকস্মাৎ এই ভয়াবহ খবরে, অথবা 'ভালো করে' ভেবে, বুঝে আর তলিয়ে দেখে, দ্বিজোত্তম কি হার্টফেল করে বসলেন ? না কি প্রেসার বাড়িয়ে ফেলে জ্ঞান চৈতন্য হারিয়ে ফেললেন ? না কি মাথা ঘুরছে বলে শুয়ে পড়লেন ?

না কই ?

সেসবের কিছুই করলেন না দ্বিজোত্তম। বরং অমিতাকে বিস্মিত আর বিচলিত করে, অমিতার এই উত্তেজিত ক্ষুব্ধ মূর্তির সামনে বসেই শান্তভাবে মেয়ের নিয়ে আসা চা খেলেন, (বড্ড কড়া হয়ে গেছেরে—বলেও সবটাই খেলেন।) কিছু খাবারও খেলেন এবং অমিতা যখন সমাপ্তি ঘোষণার ভঙ্গিতে বললেন, দ্বিজোত্তম যদি এই অনাচারের প্রতিকার না করতে পারেন, তবে অনিতা হয় গলায় দড়ি দেবেন, নয় বিষ খাবেন, তখন একটু হেসে বললেন, ও তোমার দুটোতেই অনেক ঝামেলা এ বয়েসে কেন আর এসব ঝামেলায় যাওয়া।

অমিতা ছিটকে উঠে গেলেন, আর তখনই শুনতে পেলেন কর্তা রুবিকে বলছেন, তোর ছোড়দা এলে—একবার ডেকে দিস তো!

সেই নিজস্ব শান্তভঙ্গি। নির্ঘাৎ এখন বই নিয়ে ইজিচেয়ার লম্বা হবেন।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন অমিতা! উঃ এখন যদি তিনি হার্টফেল করে পড়ে থাকতে পারতেন! দেখতো সবাই অমিতাও বিধাতার সৃষ্ট জীব! লোহা পাথরে তৈরী নয় তার বুক।···দেখতো—সবাই দেখতো।···কিন্তু ? অমিতা সেই দেখাটা দেখতে পেতেন কি ? তবে ?

আবার আজ সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা!

সুব্রত এসে মিলিদির বিছানার ধারে বসে পড়ে বলল, লোকটা একেবারে পটকে গেছে।

কিন্তু এই বিছানাটা কি নার্সিং হোমের সেই কৌশলী বিছানা ? যার হাতল ঘোরালেই 'শয্যাগত' ব্যক্তি উঠে বসে শোয়। নিজেকে খাটতে

হয় না। কোনো এক সময় যাতে শুয়ে থাকতে থাকতে মিলি ভেবেছে এই বা মন্দ কী ? এইভাবে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে চুপ করে পড়ে থাকা ! নিজের সামান্যতম কাজটুকুও নিজেকে করে নিতে হয় না তার জন্যে রয়েছে সদা সতর্ক পরিচারিকা।

নাঃ, এ সে বিছানা নয়।

এ হচ্ছে সরস্বতী দেবীর। তিনতলার ঘরের মাঝখানে পাতা বৃহৎ বিছানা। সাবেক কালের এই বৃহৎ পালঙ্ক জায়গার অভাবে অনেকদিন যাবৎ স্ক্রু খুলে খুলে জড় করে রাখা হয়েছিল সিঁড়ির চৌতারায়।

মিলির জন্য তাকে ঝেড়েঝুড়ে এককোট পালিশ লাগিয়ে তিনতলার এই সদ্যনির্মিত ঘরে স্থাপনা করা হয়েছে।

অতঃপর শৌখিন বেড্‌কভার, ঝালর দেওয়া বালিশ, রঙিন নাইলনের মশারি। সরস্বতী দেবীর নিজের অসুস্থ মেয়ের জন্যে যে রাজকীয় ব্যবস্থা হতো, আয়োজন তার থেকে বেশী বৈ কম নয়। কারণ এই ব্যবস্থাটা যেন সরস্বতীর মহিমার পরিচয়পত্র। সরস্বতীর আত্মাতৃপ্তির উপকরণ !

যে মানুষটা সরস্বতীর একান্ত নিজজন, যার সম্পর্কে সংসারের আর কারো হৃদয়গত দায়-দায়িত্বের দায় বিশেষ নেই, তার জন্যে পক্ষীমাতার ভাব তো থাকবেই, তা ছাড়াও—যাকে ভালবাসি তার জন্য কতটা করতে পারা যায় সেটা শুধু অন্যকে দেখালেই সবটা হয় না। বুঝি নিজেকেও দেখান দরকার। তার মধ্যে আত্মমোহের পরিতৃপ্তি। আতিশয্যের মধ্যেই তো ভালবাসার ওজনের হিসাব।

অতএব ভাইঝির সুখ সুবিধে নিয়ে সরস্বতীর খুঁৎখুঁতুনি আর বাড়াবাড়ি দেখে আড়ালে কেউ বিরূপ সমালোচনা করছে জানতে পারলে সরস্বতীর বাড়াবাড়ির লীলাটা যেন আরো বেড়ে যায়।

বিশেষ করে মিলির স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি সরস্বতীর পক্ষে যেন বাড়তি একটা ডিপ্লোমা। এতে সরস্বতীর যে শুধুই আনন্দ তা নয়, রীতিমত গর্বও! এবং সে গর্ব প্রকাশ করতেও ছাড়েন না। সুযোগ পেলেই কথার ছলে বলে ওঠেন, যত্নই হচ্ছে আসল ! দেখছ তো মিলির ছিরিছাঁদ খানি।···

ভাই ভাজের কাছে থাকলে এমনটি হতো ?···জানি তো ভাজের গতর। 'গতরই বলেন, 'গুণটা আর বলেন না।'।···

হ্যাঁ, 'ভাই ভাজের' কাছে থাকার প্রশ্ন উঠেছিল প্রথমে।

কিন্তু স্বাস্থ্যের অকস্মাৎ দ্রুত উন্নতি, মিলির নার্সিং হোমে থাকতেই লক্ষ্যণীয় ভাবে শুরু হয়েছিল।···তাই ধারণামত সময়ের বেশীকিছু আগেই হঠাৎ ছাড়পত্রের আদেশ এসে গিয়েছিল মিলির। সর্বশেষ এক্সরে রিপোর্টটাই না কি এই ছাড়পত্রের বাহক, মুক্তির দূত।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত রকমের উন্নতি দেখা গিয়েছিল মিলির ঘুণধরা হাড়ে। অর্থাৎ 'অপারেশন সকসেসফুল।'

টেলিফোন মারফত খবরটা শুনেই কিন্তু নারেন চলে এসেছিল।···বোধহয় সেই আটমাস আগে ভর্তি করে দিয়ে যাবার পর এই আসা! মিলি অবশ্য সেকথা তুলে কিছু বলে নি। বরং হেসে হেসেই বলেছিল, দেশে রাজ্যে ভীষণ জোরালো কোনো ঘটনা ঘটলে কি রাজ্যপদের বদল হলে যেমন অনেক সময় জেলখানার বন্দীরা মেয়াদের আগেই ছাড়া পেয়ে যায় এও প্রায় সেই রকমই, তাই না দাদা ?

দাদা বলেছিল, ও-হ্যাঁ! তা সত্যি, প্রায় তাই।

ঘরে যা বাংলা কথা বেশী গুছিয়ে বলতে পারে না দাদা। কর্মজগত অহরহই অবাঙালী, তাদের সঙ্গে হয় হিন্দীতে নয় ইংরেজিতে কথা আর বাড়িতেও ইংলিশ মিডিয়ামে পড়া মেয়েকে আরো বেশী তালিম দিতে ওরা স্বামী-স্ত্রী নিজেদের মধ্যে বাংলা তুলে দিয়ে ইংরিজির চাষ চালিয়ে চলেছে। তাই দাদার কথার ভঙ্গিই আড়ষ্ট!

কিন্তু খবর পেয়ে একা নীরেনই তো আসে নি, পিসিও এসেছিলেন। এবং নীরেন নিয়ে যাবে ভেবেই এসেছে শুনে তার সেই ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলেছিলেন, শোনো কথা, আমি বলে ঘরে বিছানাটি পর্যন্ত পেতে রেখে 'মেজর' গেলাসটি পর্যন্ত ঠিক করে রেখে তবে এসেছি। মিলি আমার হাসপাতালে পড়ে, আমার কি আহার নিদ্রা আছে বাবা ? দিন গুনছি রাত গুনছি। তুমি বাপু জোরাজুরি করতে বোসো না।

সরস্বতীর সঙ্গে এসেছিল মেজ ছেলে দেবু! দেবব্রত। বড় অমুব্রত তো বম্বে-বাসী, কদাচ আসে। এই মেজ আর ছোট ছেলে নিয়েই সরস্বতীর সংসার! মেয়ে হয় নি। মিলিই মেয়ে।

মিলিই 'মেয়ে' একথা ঠিক তবু দেবুর মনে হচ্ছিল, মার কথায় বড় বেশী আতিশয্য। যতই হোক আসলে তো নীরুদা হচ্ছে ওর নিজের দাদা, আর আমরা হচ্ছি পিসতুতো দাদা! সে তাই বলতে যাচ্ছিল, 'মা, তুমি জোর করছ বটে, কিন্তু নীরুদারও তো একটা প্রেসটিজ আছে।···নীরুদা যদি—কিন্তু কথাটা তার গলার মধ্যে সম্পূর্ণ তৈরী হয়ে ওঠবার আগেই নীরুদার গলা কথা কয়ে উঠলো—জোরাজুরির কথা উঠছে কী করে পিসি? তুমি যখন তোমার কাছে নিয়ে যেতে চাইছ, তার ওপর আবার কথা কী আছে? তার চাইতে ভালই বা কী আছে? মিলি তো তোমারই।···আর ওর যত্ন-আত্মি?···(বৌ এখানে উপস্থিত নেই তবু নীরেন গলাটাকে একটু খাটো করল!) সে তোমাদের বৌ তোমার সিকির সিকিও পারবে না কি?

দাদা একটানা এতগুলো নির্ভেজাল বাংলা কথা বলতে পারল দেখে বেশ অবাক হচ্ছিল মিলি। তবু চুপচাপ বসেছিল আয়ার হাতে মাথাটা সমর্পণ করে দিয়ে। মিলি এক্ষুনি বাড়ি চলে যাবে ভেবে সে পরিপাটি করে তার চুল বেঁধে দিচ্ছিল। জানে অবশ্য 'ছাড়পত্র' পেলেও ছাড়া পেতে অনেক সময় লাগে। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়, অনেক লেখা-লেখি করতে হয়, তবু তার ডিউটি সে তাড়াতাড়ি পালন করে ফেলছে। এখন আবার কোনো পেশেন্টের সেবা করতে হবে, কতদিনে জুটবে! এখনই খোঁজ নিতে যেতে হয়।

কিন্তু সরস্বতী তাকে নিশ্চিন্ত করলেন। বলে উঠলেন চুলটুল বাড়ি গিয়েই বাঁধা হবে বাছা। তুমি তো আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছ, এই নার্সিং হোমের গিন্নীকে আমি বলে এসেছি। তোমার সেবা যত্নর হাতটি ভালো। থাকবে কিছুদিন।

একথার পর দেবুর মনে হলো, আতিশয্যরও একটা সীমা থাকা উচিত। হতে পারে টাকাকড়ি আছে সরস্বতীর। নিজেরই আছে। বাবা তাঁর স্ত্রীর

জন্যে অনেক কিছু ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছিলেন। নানা কোম্পানীর শেয়ার, নানা রকমের লাইফ ইনসিওর, তা বলে সেগুলোকে অন্যায়ভাবে ছড়িয়ে নষ্ট করতে হবে? কেন এই অধিক মূল্যের মহিলাটি ছাড়া, আর লোক জুটবে না?

তখনই দেবু শেষ চেষ্টা করবার চেষ্টা করল। বলে উঠলো, তোমরা তো বেশ একতরফা ডিক্রি দিয়ে ফেললে। আসামীরও তো ইচ্ছে অনিচ্ছে থাকতে পারে? কিছু বক্তব্য থাকতে পারে। মিলির মতামতটা তো জানতেই চাইলে না।

সরস্বতী ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। সরস্বতী কি সেই মুখের রেখায় ফুটে ওঠা ভাষাটি বুঝতে পারেন নি?···

পেরেছেন খুবই।

তবু সরস্বতী অবোধ সেজেছিলেন।

শ্যাওলায় পা না ঠেকিয়ে তার উপর দিয়ে জল গড়িয়ে যেতে দিয়েছিলেন, ওমা, কেন রে? মিলি তো এই স্বপ্না না কি যেন নাম এর, একে বেশ পছন্দই করে। অনিচ্ছের কী আছে?

মিলি মনে মনে হাসল।

মিলি এটাও বুঝল তাকে নিয়ে পিসির এই মেজ ছেলের সঙ্গে কিছু অদৃশ্য যুদ্ধ চলবে। যাক এটা নতুন নয়। সমীরণের সঙ্গে বিচ্ছেদের কালে, এ অনুভূতির অভিজ্ঞতা তার হয়েছে।···পিসি দশহাত বাড়িয়ে ভাইঝিকে সমর্থন করেছেন, এবং অলক্ষ্যে থেকেও সেই পাজী লক্ষ্মীছাড়া বদমাইস জামাইটাকে নভূতো ভবিষ্যতি গাল পেড়েছেন, কিন্তু তার নিজের দাদার মতো এই পিসতুতো দাদারাও অনুরূপ ঘোষণায় জানিয়েছে, মিলির অসহিষ্ণুতাই এর কারণ। একটা চেষ্টা করলে, একটু ধৈর্য ধরলে হয়তো মিলি এই সম্পর্কটা ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়াটা রক্ষা করতে পারতো।···পুরুষ মানুষ, অনেক কাঁচা টাকার মালিক, মতিগতি একটু বিগড়োতেই পারে। স্ত্রীর তো উচিত তাকে রক্ষা করা। তা নয়—ভেসেই যেতে দিলে তুমি অসহিষ্ণু মেয়ে।···এই অসহিষ্ণুতার কারণটি যে পৃষ্ঠবল, এ সন্দেহও অনুক্ত থেকেও

উক্ত হয়েছে।

সরস্বতীর বড় ছেলে অনুব্রত তখন কলকাতাতেই পোস্টেড ছিল। তার মন্তব্য আরো মধুর ছিল। 'ছেলেবেলা থেকেই আদর দিয়ে মাতো ওর মাথাটি খেয়ে রেখেছেন।'

মিলিকে কি ওরা একেবারেই ভালবাসে না?

তা নিশ্চয় নয়। ছেলেবেলা থেকেই মিলি সকলের কাছে আকর্ষণীয়। মিলির রূপ, মিলির ব্যবহারের মাধুর্য, মিলির প্রাণোচ্ছল স্বভাব, সকলকেই আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু মায়ের ওই ভালবাসার বাড়াবাড়ি, এটা অসহ্য। এটা ঈর্ষাউদ্রেককারী যেটা যার যথার্থ প্রাপ্য নয় সেটা তাকে দিতে বসা মানেই তো ন্যায্য অধিকারীদের ভাগ থেকে খানিকটা কমে যাওয়া।

মিলির এসব বুঝতে অসুবিধে হয় নি।

তাই মিলি তখন দাদাকে উৎখাত করে একটা চাকরি যোগাড় করেছিল, আর একটা থাকার আস্তানা।···

কিন্তু এখন মিলি একেবারে পিসির মুঠোর মধ্যে চালান হয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছে। অতএব কিছু রঙিন নাটকের দৃশ্য দেখতে হবে মিলিকে।

হোক। দেখা যাক ভাগ্য কোথায় নিয়ে যায়।

নীরেন ওদের গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে ফিরে এলো নার্সিং হোমের বিল-টিল মিটিয়ে দিয়ে যাবে।···কি করেই বা তবে বলা যায় মিলির দাদা মিলি সম্পর্কে উদাসীন! একমাত্র বোনটা সম্পর্কে তার দায়িত্ববোধ নেই!

এরা অবশ্য সন্দেহ করে, এসবের অনেক কিছুই নীরুবৌদির অজ্ঞাত থাকে।···কিন্তু তাই যদি থাকে, তাতেই বা কি? শুধু কি মেয়েদেরই সংসার জীবনে অভিনেত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়? পুরুষের হয় না? পুরুষের জীবনেও অনেক ম্যানেজ করতে হয়। সেটা করছে নীরেন।

গাড়িতে যেতে যেতে দেবু আবার বলে উঠলো, দেখ মা, তোমার ওপর কথা বলতে পারল না নীরুদা, তবে ভেতরে একটু 'ইয়ে' হয়েছে নিশ্চয়ই। স্নেহ ভালোবাসায় না হয় তোমায় ছাড়িয়ে উঠবে না, তবে প্রেসটিজেরও প্রশ্ন আছে তো একটা।···নিজের দাদার বাড়িতে না গিয়ে মিলি 'কাজিন'

দাদার বাড়িতে—

সরস্বতী ওর কথাটা শেষ হতে দেন নি। গম্ভীরভাবে প্রুফটা কারেকশান করে দিয়েছিলেন, 'কাজিন' দাদার বাড়ি নয় দেবু। নিজের পিসির বাড়ি।

এরপর আর কথা বলার ক্ষমতা থাকে না দেবুর। রুচিও না। তাদের স্ত্রীর বশংবদ পিতাঠাকুরটি বাড়িখানিও তো স্ত্রীর নামেই রেখে দিয়ে গেছেন। অতএব বাড়ি সরস্বতী দেবীর। অর্থাৎ মিলির নিজের পিসির।

দেবব্রতর ভাগ্যটি আবার অদ্ভুত।

লোকে বৌকে লুকিয়ে বোনটোনের ওপর কর্তব্য করছে, আর দেবু? দেবু বৌয়ের কর্তব্যজ্ঞানের বহরেই দিশেহারা। মহিলাটি যেন কর্তব্য-জ্ঞানের জাহাজ।···শুধু তাই? বাংলা ভাষায় যতগুলি মহৎ মহৎ শব্দ আছে, 'সরলতা, উদারতা, ন্যায়পরতা, স্পষ্টবাদিতা, ভদ্রতা, সভ্যতা ইত্যাদি করে, সবগুলিই দেবুর বৌয়ের মধ্যে বর্তমান।···

দেবু যদি মায়ের এই আতিশয্যের আধিক্য নিয়ে বৌয়ের কাছে সমা-লোচনায় মুখর হতে চায়, বৌ নির্ঘাৎ প্রথম কথাতেই কোপ দিয়ে বলবে, তা এতে তোমার এত গাত্রদাহর কী আছে? তোমাদের নিজের বোনও তো থাকতে পারতো একটা? একটা কেন, দুটো-চারটেও থাকতে পারতো, কী করতে? একটাও অন্তত থাকতেই তো পারতো। ধরে নাও না তাই!

ভেবেই রাগে হাড় জ্বলে গিয়েছে দেবুর। তবু পরে বৌয়ের কাছে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন না-করে পারে নি। বলা বাহুল্য সেই উত্তরই পেয়েছে, মিলিদিকে মায়ের নিজের মেয়ে ভাবলেই তো জ্বালা মিটে যায় বাবু। ধরে নাও না তাই।

ধরে নাও না। 'ধরে নিতে' গেলে তো কোনো কিছুরই সীমা থাকে না।

সুজাতা অনায়াসে বলে বসে, তা মার জিনিস মার টাকাকড়ি মা যেভাবে ইচ্ছে খরচা করবেন, যাকে ইচ্ছে দেবেন, তোমার এত মাথাব্যথা কেন? তোমার কাছে তো চাইতে আসছেন না?···আর তোমার টাকা তুমি

সব ব্যাঙ্কে তুলছ না খরচ করছ তাও জিগ্যেস করতে আসছেন না? ছটফটানি কমাও তো। শান্তিতে থাকবে।

বৌয়ের মুখ থেকে একথা শুনতে হলে কার মেজাজ ঠিক থাকে? দেবুরও থাকে না। কিন্তু জবাবও তো জোগায় না। বড় জোর হয়তো বলে আমি কোনো বাড়াবাড়ি করতে যাই না।

সুজাতা মুখ টিপে হাসে।

বলে, আহা, একটু যদি শিখতে সেটা আমার একটু সুবিধে হতো।···দেবুর কৃপণতার প্রতি এই কটাক্ষপাতে আরো হাড় জ্বলে যায়।···কিন্তু, বলার কিছু নেই।

অতএব মিলির এ-বাড়িতে রাজকীয় ব্যবস্থা চালু হলো।···সরস্বতীর মধ্যে উৎসাহের জোয়ার।

হয়তো মিলির এই অপ্রত্যাশিত স্বাস্থ্যোন্নতিও এর কারণ। যে জিনিসটা হাত থেকে ছেড়ে গিয়ে জলের তলায় তলিয়ে গেছে ভেবে আশা ছেড়ে বসে দুঃখের নিশ্বাস ফেলেছ, হঠাৎ যদি দেখা যায়, সেটা ভেসে উঠেছে তখন তাকে টেনে তুলবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টার উৎসাহ ব্যাকুলতা আসে বৈ কি। মিলির দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি সরস্বতীকে প্রায় হতাশ করেই রেখেছিল। হঠাৎ আশার সঞ্চারে, সরস্বতী যেন 'সর্বস্ব দিতে পারার' পণ ধরেছেন।··· না-হলে, নিজের বিয়ের সাবেকী পালঙ্ক, যা না কি কর্তার বিয়োগের পরই স্ক্রু খুলে খুলে সরিয়ে রাখা হয়েছিল, সেই পালঙ্ক ফের জোড়া দিয়ে পাতা হলো কিনা মিলির জন্যে।

দেখে মেজাজ ঠিক রাখা যায়?

দেবু সরাসরি মাকে না বলে মায়ের কাজের সাপোর্টার বৌকেই বলে, এটাকেও তুমি বাড়াবাড়ি বলবে না?

বৌ বলল, কি জানি, আমার তো কই বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে না। একটা খাট বিছানা দরকার পড়েছে, বাড়িতে থাকতে কি আবার নতুন কিনতে যাবেন? সেটাও তো বাড়াবাড়ি মনে হতে পারতো।

ওঃ!

দেবু মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছে, আর এই যে শুনছিলাম, মার ঘরের পাশের ছোট ঘরটায় ওর ব্যবস্থা হচ্ছে—

বৌ বলল, মা নিজের সিঁড়ি ভাঙা বাঁচাতে তাই বলেছিলেন, আমিই বললাম, ওঘরে আয়াটায়া নিয়ে থাকা সম্ভব না কি? এটা এমনি পড়ে রয়েছে—

এমনি পড়ে রয়েছে! চমৎকার!

দেবু জানে বৌয়ের কাছে সে তার সঙ্কীর্ণতার সমর্থন পাবে না, তবু মনের জ্বালা প্রকাশ না করেও তো পারে না। অথবা হয়তো সঙ্কীর্ণতা ভাবে না। ভাবে আমিই ন্যায্য বলছি। তাই বলে ফেলে, দাদার নাম করে তৈরী নতুন ঘরটা, এত চমৎকার আমারই ইচ্ছে হয়েছে এসে শুই, বলতে পারি নি—

ওমা!

বৌ অবাক হয়, কই এমন ইচ্ছের খবর তো পাই নি কোনোদিন। পড়েই তো রয়েছিল —বললেই পারতে।

বলতে পারি নি লজ্জায়। জানি তো দাদার পাঠানো টাকা থেকে তৈরী হয়েছে—

সুজাতা এতক্ষণে হাল্কা ভাব ত্যাগ করে গম্ভীর হয়েছে। বলেছে, দাদার পাঠানো টাকায় ঘরটা তৈরী হয়েছে বলে তুমি ইচ্ছে হলেও শুতে পার নি? আশ্চর্য! দাদারা কি পরশুই কানাডা থেকে এসে পড়ছেন?

তা না হোক, মানে হচ্ছে—

থাক। তোমার কথার মানে বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই। বাবার টাকায় তৈরী বাড়িতে বাস করা যায় আর দাদার টাকায় হলেই অচ্ছ্যুৎ? আমার বুদ্ধির বাইরে।

এই বৌকে নিয়ে ঘর করতে হয় বলেই দেবু মাকে কায়দা করতে পারল না আজ পর্যন্ত।

হয়তো সরস্বতীরও এটি একটি পৃষ্ঠবল, তিনিও এই বলেই ছেলেকে নস্যাৎ করতে পারেন। বড় ছেলে বৌ বিদেশবাসী হয়েছে, তাতে তিনি দুঃখিত

নয়। নাতিটুকুর জন্যে মন কেমন করে, কী আর করা? সুখের থেকে স্বস্তি ভালো।

সুজাতা অন্য ধরনের মেয়ে।

স্বার্থবুদ্ধির ছাঁচে তৈরী নয় সে।

কথা যা বলে, তাতে ভাবাবেগের স্পর্শ না থাক, যুক্তি আছে। সুজাতাই বলেছে, আপনি তো মা দু'বেলা ওঠেনই ওপরে ঠাকুর ঘরে যেতে। দু-ঘণ্টা দু-ঘণ্টা চার-ঘণ্টা থাকেনও। মিলিদির জন্যে না-হয় আর দু'বার উঠলেনই। না হয়তো ওপরে থাকার সময়টাই বাড়িয়ে নেবেন। চারঘণ্টা চারঘণ্টা আটঘণ্টায় পৌঁছবেন।

হেসেছিল?

সরস্বতীও হেসেছিলেন তবে অনুধাবন করেছিলেন কথাটা ভালোই বলেছে। নিজের গায়ের কাছে একটা আয়া ঘুরবে ফিরবে, বসবে শোবে, সুবিধের নয়। তাছাড়া ছ্যুৎ বাঁচিয়ে মেজেয় পা ছড়িয়ে বসবারই বা জায়গা কোথায় ওঘরে? এখানে ছাদে আলাদা জলের কল, কাপড় শুকোতে দেবার জায়গা, সুবিধে অনেক।

মনে মনে ঠিক করলেন, এরপর বড় ছেলে এলে অন্য ব্যবস্থা ঠিক করে নিলেই হবে। মিলি যে এ-জীবনে আর চাকরি-ফাকরি করতে পারবে, তা মনে হয় না। তবে যদি 'ভালো আছি' বলে জেদ করে করেও, অন্যত্র থাকতে তো দেবেনই না তাকে সরস্বতী! এই তার চিরস্থায়ী জায়গা হয়ে গেল।···তখন ওই সরস্বতীর পাশটিতে। তিনিও তো ক্রমশ বুড়ো হবেন? আপন বলতে, বুকের কাছে থাকতে কে আছে আর? এই যে পাশের বাড়ির রমেশবাবুর মা, আজ দু'বছর বিছানায় পড়ে। যাই ভাগ্যিস একটা মেয়ে বিধবা হয়ে কাছে এসে পড়েছিল, তাই না রক্ষে? নইলে কী হাড়ির হাল হতো? পয়সার জোর নেই যে লোক রাখতেন। চিরদিনই বিধবা মেয়ে, স্বামী পরিত্যক্তা মেয়ে, সংসারের একটা লাভের খাতা।···মিলির দুর্ভাগ্য সরস্বতীর কি প্রাণ ফেটে যায় না? তবু মিলির যে অন্য কোথাও আশ্রয় নেই, এটা মন্দের ভালো। মেজ বৌটা ভালো, ভবিষ্যতে সংঘর্ষের

আশঙ্কা নেই।

এখন সরস্বতী যখন পুজো সেরে এসে মিলির মুখে ঠাকুরের চরণামৃত দেন আর মস্ত ঘরখানার মেজেয় পা ছড়িয়ে বসে পড়েন বিছানার ছোঁওয়া বাঁচিয়ে তখন মনে মনে বৌয়ের বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারেন না।

আর যারা এসে বসে, খাটের ধারে বিছানার উপরই বসে, বসবার যথার্থ জায়গার একটু অভাব আছে। অবশ্য তাতে কিছু এসে যায় না। বৃহৎ পালঙ্ক। সোফা চেয়ার ঘরে না থেকেও চলছে।

মিলি বলে রুপোর কাঠি ছোঁওয়ানো রাজকন্যের মতো পেল্লায় পালঙ্কে পড়ে আছি।

তবে এখন আর পড়ে থাকে না। বসে, হাসে, গল্প করে, মাঝে মাঝে টুকটাক গানও গায়। এখন মিলির ঘরটাই সন্ধ্যায় পারিবারিক আড্ডার জায়গা হয়েছে। সুজাতা আসে সুব্রত আসে, বড় ছেলের শ্বশুরবাড়ি কাছে, তার শালা আর শালার বৌ মাঝেমাঝেই আসে। হাসি গল্পের সাড়ায় সরস্বতীর পুজো থেকে মন সরে আসে, তাড়াতাড়ি সেরে এসে রঙ্গমঞ্চে হাজির হন। আর বলে ওঠেন, সব গল্প আড্ডাগুলো শেষ হয়ে গেল?

মিলি বলে, গল্প আড্ডা কি 'শেষ' হবার জিনিস পিসিমা? এ হচ্ছে অশেষ বস্তু।···

কিন্তু দেখা যায়, সরস্বতী এলেই সভা স্তিমিত হয়ে পড়ে, হাসির সেই প্রাবল্য থাকে না।···

এটা দুঃখের। কিন্তু আর একটা কারণেও সরস্বতীর মনে সুখ নেই। লক্ষ্য করছেন, তাঁর ছোটছেলেটির যেন বড্ড বেশী 'মিলিদি মিলিদি।' এত কেন? হয়তো এ চিন্তা মনের কোণেও আসতো না সরস্বতীর, যদি না নার্সিংহোমের ব্যাপারটা ঘটতো। সরস্বতী না বলতে সুব্রত যেত এটা সন্দেহজনক, আবার সে খবরটা বাড়িতে গিয়ে বলতো না সেটা আরো সন্দেহজনক।

সেই সন্দেহ বিষের বীজ থেকে যেন চারা জন্মে গেছে, এবং হঠাৎ হঠাৎ নতুন পাতার সৃষ্টি করছে।

অথচ সন্দেহটা যে নিতান্তই নীচ তা বোঝেন সরস্বতী। আর বোঝেন বলেই তার বাষ্পও মুখে আনতে পারেন না।—শুধু মনে মনেই আওড়ান সারাক্ষণ খালি মিলিদি, আর মিলিদি! বাড়ি ঢুকেই অমনি ছুটছেন মিলিদির মন্দিরে। হড়ে পড়ে পড়ে থাকতে হবে সেখানে। আগের মতন আর বাইরের আড্ডা বাতিকও নেই।

আর মুখে হেসে হেসে বলেন, মিলি তুই আসায় আমার এক মস্ত উপকার হয়েছে, সুবোকে দেখতে পাচ্ছি সব সময়। নইলে ছেলের তো টিকি দেখার জো ছিল না। সুবো তোর সঙ্গে বসে লুডো খেলছে। দেখে তাজ্জব।

মিলি হেসে হেসে বলে আমরা হঠাৎ হঠাৎ আবার ছোটবেলায় ফিরে যাবার চেষ্টা করি পিসি। চোখ বুজে ভাবি ফ্রক পরা মিলি, আর হাফপ্যাণ্ট শার্ট পরা সুবু ছাতে উঠে পিং পং খেলছে, ব্যাড্‌মিণ্টন খেলছে, ঘরে বসে লুডো খেলছে। দেবুদাও তো ভিড়ে যেত তাতে। এখনই ভারী বিজ্ঞ হয়ে উঠেছে।

এ আবহাওয়ায় মনের পাপের কথা ভেবে হঠাৎ লজ্জা হয়। সরস্বতীর উপস্থিতিতে তো সবই নির্মল লাগে, উজ্জ্বল লাগে।···কিন্তু তিনি অন্য জায়গায় থাকলেই অন্যরকম। যেই দেখেন ছেলে বাইরে থেকে এসেই ওপর তলায় ছুটছে, রাগে মাথা জ্বলে যায়। আরো রাগ হয়, মেজ বৌয়ের বুদ্ধিহীনতায়। দিব্যি গা ভাসিয়ে বলে কিনা, চলে যান ছোড়দা ওপরে। আমাদের তিনজনের চা নিয়েই ওপরে গিয়ে হাজির হচ্ছি।

কিন্তু দোষই বা দেবেন কী করে?

নিজেই তো বলেছিলেন, অভাগা মেয়েটা তোমাদের কাছে এসে পড়েছে, ওর যাতে মন ভালো থাকে, সে চেষ্টাটুকু তোমরা কোরো বাপু।

তাই করছে ওরা সে চেষ্টা।

সুব্রত নীচে থেকে উঠে এসেই হৈ চৈ করে ওঠে। আজ রাস্তায় যা একখানা দৃশ্য দেখলাম মিলিদি···আজ বাসে যা একটি মারকাটারি ঘটনা ঘটল।···

ঘটনা হয়তো এক বিন্দু, কিন্তু বিন্দুকে সিন্ধু করে তুলতে না পারলে আর

আড্ডা কি ?

মিলি যতটা না উৎসাহ বোধ করে, উল্লাস পায় তার দশগুণ। অতএব জমে উঠতে দেরী হয় না।

তবে আজ তো সত্যিই একটা খবর।

আবার আজকে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা! লোকটা একেবারে পটকে গেছে।

মিলি কি বুঝতে পারল না ?

অবশ্য পারল। তবু উৎসাহ দেখিয়ে বলল, কে রে ? কোন্ ভদ্রলোক আবার পটকাতে বসল ?

সুব্রত ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, বুঝতে পারলে না ?

মিলি আকাশ থেকে পড়ল, ও মা! কী করে বুঝবো ? শুধু 'সেই ভদ্রলোক' বললে বোঝা যায় ? নাম বলবি তো! আমি চিনি ?

চেনো, খুব চেনো।

মিলি ভাববার ভান করল। তারপর হতাশভাব দেখিয়ে বলল, নাঃ বাপু! নাম না জানলে বোঝা শক্ত।

নাম সমীরণ সেন।

এই মরেছে!

এবার আরো উঁচু আকাশ থেকে পড়ল মিলি। ভুরু উঁচিয়ে বলল, তবে যে বললি সেই 'ভদ্রলোক'।

সুব্রত তীক্ষ্ণ হলো, সভ্যলোকেরা ওই ভাবেই কথা বলে।

হ্যাঁ! তাও বটে!···মিলি যেন এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে এই ভাবে বলল, যে যা তাকে তা বললে সভ্যতায় বাধে বটে! সভ্যতার প্রথম পাঠ, 'কানাকে 'কানা' বলিও না, খোঁড়াকে 'খোঁড়া' বলিও না। তাই না ?···হি হি হি! তা আজ ও গাড়ি চড়ালো বোধহয় ?

না!

তবে কোথায় দেখলি পটকা হয়ে যাওয়া ?

কফি হাউসে। আজ ড্রাইভার ছিল, তাকে গাড়ি নিয়ে চলে যেতে বলে

আমায় একটা কফি হাউসে টেনে নিয়ে গেল।

তাই বল্! মিলি যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল, সেদিন গাড়ি চড়ানো, আজ পান ভোজন, উকিলের ফীজটা ভালোই দিচ্ছে তাহলে।

সুব্রত তাকিয়ে দেখে।

সবটাই সত্যি মনোভাব? না কৃত্রিম? মেয়েরা তো অভিনয়ে চিরপটু। আমারই তো লোকটাকে দেখে মনটা ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। আর মিলিদি একটুও—

বলল, আমায় রাগিয়ে তুলতে পারবে না মিলিদি! আমি স্বীকার করছি, এখন আর ওকে দেখে রাগ চড়ে ওঠে না আমার।

তার মানে মহাপুরুষ হয়ে উঠছিস, যাক! চোখের সামনে একটা জলজ্যান্ত মহাপুরুষ দেখতে পাচ্ছি, কম ভাগ্যের কথা নয়। তো খুব কেঁদে কেটে পটকাবার হেতুটা বলল না?

সুব্রত মনে মনে হাসল।

বলল পথে এসো।

মুখে বলল, কাঁদাকাটার কথা নয়, তবে ভাগ্যটা খুব অদ্ভুতই লোকটার।

মিলি সকৌতুক ভাব মুখে ফুটিয়ে কথা বলছিল, সে ভাবটা হঠাৎ মুখ থেকে মুছে গেল। দৃঢ়ভাবে বলল, বুদ্ধিকে আর ভাগ্যকে গুলিয়ে ফেলিস-নি সুবু।

সে তুমি যা ইচ্ছে বলতে পারো। তবে আমি বলব ভাগ্যই। শুনলে বিশ্বাস করবে? সেই যে ঠিক করেছিল এবার একটা নিরক্ষর গ্রাম্য মেয়ে বিয়ে করবো। তাও আর হচ্ছে না।...ঠিক ইচ্ছে অনুযায়ী একটা মেয়ে জুটেও ছিল, কিন্তু শুনলে অবাক হবে, গ্রামের মেয়ে, বাপের সঙ্গে এই প্রথম কলকাতায় এসেছে, বাপ মেয়েকে সমীরণবাবুর বাড়িতে নিয়ে এসেছে 'দেখাতে', সেই মেয়ে না কি ফিরে গিয়ে বলেছে, অতবড় বাড়ি, অত বাহার, অত ফর্সা বর, সে বিয়ে করতে পারবে না। কেটে ফেললেও না।

মিলি মুখে হাত চাপা দিয়ে হেসে ওঠে।

বেশ কিছুক্ষণ পর বলে, মালটি কোথা থেকে জোটানো হয়েছিল?

কান দিই নি। বোধহয় কোথায় যেন ওর দিদি আছেন, তাঁরই গ্রামের। বেচারা!

মিলি অন্য আর এক দিনের সুরেই বলল কথাটা।

তারপর বলল, সেই দুঃখেই বুঝি পটকে গেছে? আহা 'রিজেক্ট' মাল-হাওয়া! বড় দাগা পেয়েছে।

সুব্রত একবার উঠে ঘরের সামনের খোলা দরজাটার সামনে দাঁড়াল, সেখান থেকেই বলল, তোমার হুইল চেয়ারটা নিয়ে এখানে চলে আসবে? খুব সুন্দর হাওয়া।

মিলি বলল, আরে। কখনো আমি হুইল চেয়ারের পোষা আছি না কি? বেরোই তো ছাতে।

এমনি হেঁটে?

এমনি হেঁটে।

সুব্রত বলল, তাহলে আমার একটু বলা ভুল হয়ে গেছে। তোমার কথা জিগ্যেস করায়—বললাম।

মিলি এখন হঠাৎ রেগে উঠলো।

বলল, আমার কথা জিগ্যেস করার ওর কী দরকার?

হয়তো আছে দরকার।

কক্ষনো বলবি না তুই। খবরদার না।

কথা দিতে পারছি না।

তোর কি কোনো মান-মর্যাদা নেই সুবু?

লোকটার ঝুলে পড়া চেহারা দেখে ওটা আর মনে আসে না মিলিদি।

সংসারে অনেক 'ঝুলে পড়া' লোক আছে সুবু, দেখলেই গলে গেলে চলে না।

সুব্রতও রাগরাগ ভাব দেখাল। ছাত থেকে চলে এসে আবার বসে পড়ে বলল, গলে যাওয়ার কথা হচ্ছে না। সুব্রত এত ইয়ে নয়। তবে—

থাক বাবা, 'তবেটা রাখ। বরং উঠে পড়ে লেগে ঘটকালি কর। যে অন্তত ওকে হি হি 'অতো ফর্সা' বলে রিজেক্ট করবে না।

সুব্রতও হেসে উঠল, হাসছ তুমি। আমি কিন্তু সেই গ্রাম্য মেয়েটার মনোভাব বুঝতে পারছি।

পারবি বৈ কি। কবিতা-টবিতা লিখিস। হ্যাঁরে তোর সেই প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বালি কাঁকর' ছাপার কতদূর?

পাবলিশারই জানে।

নামটা সুবিধের হয় নি। একদম সেকেলে।

তাই মনে হচ্ছে। আচ্ছা 'শঙ্করমাছের চাবুক' নাম দিলে কেমন হয়?

মার্ভেলাস!

মিলি হাততালি দিয়ে হেসে ওঠে।

ঠিক এই সময় সরস্বতী ঢুকলেন।

পুজোর ঘর থেকেই চলে এসেছেন। পরনে গরদখান, কপালে চন্দন টিপ, হাতে হরিনামের মালা।

এসে পরিস্থিতির উপর একটি চাপা বিরক্তির কুটিল দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলে উঠলেন, কী এত হাসির ঘটনা ঘটলো? ভাইবোন একেবারে হেসে কুটি কুটি।

মিলি খুব অমায়িক গলায় বলল, ও এক বোকা বুদ্দু লোকের কথা হচ্ছে পিসি! সুবুর কাণ্ড তো তাকে একটু আহা উহু করে তার পয়সায় রেষ্টুরেন্টে খেয়ে-টেয়ে হি হি···শুধু কফি কাজু না আরো কিছুও রে সুবু, আইসক্রীমও বাগিয়েছিস মনে হচ্ছে! ও তোর কনে যোগাড় করে দেবে আশা দিয়ে হি হি!

কিন্তু সরস্বতী কি বোকা বুদ্ধু?

সুজাতা উঠে এলো।

তার পিছনে চায়ের ট্রে হাতে 'সুবালার মা'।

মিলি বলে উঠলো, এই সুজাতা, এতক্ষণে এলি? আমাদের যত মজার মজার কথাগুলো হয়ে গেল।

সরস্বতী তীক্ষ্ণ চোখে ভাইঝির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন।···এমন অস্বাভাবিক লালচে কেন মুখটা? স্বভাবের অতিরিক্ত এমন প্রগল্‌ভতা

কেন ?·· এ আবার কী বিপদ ! নাঃ। শক্ত হতে হবে। মস্তানটার একটা বিয়ে দিতে পারলে হয় তাড়াতাড়ি।···'এখন নয়' বলে ন্যাকামি করতে এলে ধুদ্ধ ড়ি নেড়ে দেবো।

সরস্বতী সম্ভাব্য কনে খুঁজতে থাকেন মনে মনে।

অমিতা আবার পাথর হয়ে গেলেন।

প্রায় ভাবশূন্য মুখে স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি মত দিলে ?

দ্বিজোত্তম শান্ত মুখে বললেন, অ্যাডাল্ট ছেলে মেয়ের বিয়েতে 'মত দেওয়া-দিই' তো একটা বোকা কথা।

ওঃ ! তাই তুমি চালাক হলে ? ··পাথর উত্তপ্ত হয়, ঘটা করে ছেলেকে ডেকে, তাকে বোঝাবার বদলে এই করলে তুমি ?

ঘটা করার কী হলো ? ডাকলাম জিগ্যেস-টিগ্যেস করলাম, ওর মনের। মহৎ ভাবের পরিচয় পেয়ে শ্রদ্ধাই এলো !

পাথরে চিড় খায়, ওঃ ! শ্রদ্ধা এলো। তাই বলো ! মহৎ বাপের মহৎ ছেলে, তাই তার তালে তাল দিয়ে বাহবা নিলে !···অমিতা বিদীর্ণ কণ্ঠে বললেন, ছেলেটার আখেরের কথা ভাবলে না তুমি ? এখন ঝোঁকের মাথায় মহত্ত্ব করতে বসছে। কিন্তু ওই ছোটলোকের উচ্ছিষ্ট হতভাগা মেয়েটাকে বৌ করে ও সুখী হবে মনে করছ তুমি ?

আহা সেই কথাই তো জিগ্যেস করলাম ! দ্বিজোত্তম বলে উঠলেন, বললাম নিজের মনকে ভালো করে ভেবে দেখ। হয়তো এ জন্যে তোমায় অনেক কিছু ত্যাগ করতে হবে। কুড়োতে হবে লোকনিন্দে, অবজ্ঞা, অবহেলা। বলতে গেলে সমাজের বাইরে গিয়েই পড়তে হবে, পারবে তো ?···বলল, পারার চেষ্টা করব।

ওঃ এইভাবে গায়ে মাখন বুলিয়ে বুলিয়ে কথা বলা হলো ? যাচ্ছেতাই করে জানিয়ে দিতে পারলে না, লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, এ-বিয়ে করলে তোকে আমি ত্যাজ্যপুত্তুর করবো।

দ্বিজোত্তম একটু হেসে অমিতার প্রায় ফাটন্ত ভঙ্গির দিকে তাকিয়ে বললেন,

'যাচ্ছেতাই' করতে তো তুমিই রয়েছ, আমি আর বৃথা খাটি কেন ? আর 'আমি তোকে ত্যাজ্যপুত্তুর করব',এ-কথাই বা বলতে যাব কেন ? করব, এমন কথা তো ভাবি নি !

ভাবো নি ?

পাথর ফেটে চৌচির হয়ে গেল ! ছিট্‌কে ছিট্‌কে পড়ছে তার খোঁচা খোঁচা টুকরো।

ভাবো নি তবে কী ভেবেছ ? ওই বৌকে 'দুধে আলতার' পাথরে দাঁড় করিয়ে আদরে বরণ করে ঘরে তুলে ছেলে বৌ নিয়ে সুখে ঘর করবে ?

দ্বিজোত্তম বেশ ভালভাবেই হেসে ফেলে বললেন, 'দুধ আলতা' এসব ঠিক ভাবি নি, জানতামনাও তবে গৌতম যাকে বিয়ে করে আনবে, তাকে নিয়ে সুখে ঘর করতে চেষ্টা করবো এটা ভেবেছি।

আরো টুকরো ছিটকোচ্ছে পাথরের।

ঘরে আনবে ! গৌতম যাকে ঘরে আনবে ! কি ভেবেছ কী তুমি ? আমি ওই বৌকে বাড়ি ঢুকতে দেবো ?

দ্বিজোত্তম এখন গম্ভীর হলেন।

বললেন, বৌকে ঢুকতে না দেওয়া মানেই তো ছেলেকে ঢুকতে না দেওয়া।

তা মা-বাপ সমাজ সংসার সব ত্যাগ করে যদি ওই বিয়েটাই লক্ষ্মীছাড়াকে করতে হয়, তো এ-বাড়ির দরজা ওর কাছে বন্ধ ! মনে জানবো গৌতম বলে আমার কোনো ছেলে ছিল না।

শেষের দিকটা গলাটা কেঁপে যাচ্ছিল বোধহয়, সামলে নিলেন।

দ্বিজোত্তমের চোখে এই সামলানোটা এড়ালো না। আস্তে বললেন, পারবে ?

পারব না মানে ? আমাকে তুমি ভাবো কী ? মায়ায় গলে পড়া হ্যাংলা মা কত শক্ত হতে পারি সময়ে দেখো। যে ছেলে আমার মুখে চুনকালি দিতে পারে তার ওপর আবার কিসের মায়া ?

দ্বিজোত্তম গভীর শব্দের কথা বলতে অভ্যস্ত নয়, তবে গলার স্বরটা গভীর শোনালো। বললেন, আমার অবশ্য ওই একটা চিরকেলে কথা শোনা ছিল, 'কুপুত্র যদ্যপি হয়' না কি ! তা সেটা তুমি তাহলে মিথ্যে করে দিচ্ছ ?

মাতৃস্নেহের থেকে বড় হয়ে উঠছে তোমার অহঙ্কার !

অহঙ্কার ? অহঙ্কার মানে ?

অহঙ্কারই অমিতা !···দ্বিজোত্তম একটা নিশ্বাস ফেললেন।

বহুদিন পরে 'অমিতা' বলে সম্বোধন করলেন দ্বিজোত্তম। কে জানে কতদিন পরে। বললেন, নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছেকেই প্রাধান্য দিচ্ছ সেটাই অহমিকা, অহঙ্কার। অথচ এ-কথাও তো ভাবতে পারতে, 'বিনাদোষে দুঃখ অপমান পাওয়া একটা মেয়েকে তোমার ছেলে মান সম্মান দিয়ে বাঁচিয়ে তুলতে চেষ্টা করছে, এটা আমারই গৌরব।'

থামো থামো রাখো তোমার বড় বড় কথা !

অমিতা রুদ্ধ গলায় বললেন, চিরটাকাল নিজে 'মহৎ' হবার সুখটি নিয়ে, আমার জীবন মহানিশা করে রেখেছো। ছেলে মেয়ে জানে, বাবা ভালো, মা মন্দ। বাবা উঁচুমন মা নীচুমন। ঠিক আছে, তাই জানুক। গৌতম যদি তোমার প্রশ্রয়ে ওই বৌ নিয়ে এবাড়ির চৌকাঠ ডিঙোতে আসে, সঙ্গে সঙ্গে আমি বিদেয় হয়ে যাবো। ব্যস। আর এবাড়িতে দরকার কী ? এতই যখন আসপদ্দা বৌ নিয়ে চৌরঙ্গীতে বাড়ি ভাড়া করে থাকুকগে না !

রুবি এই নাটকের নীরব দর্শক হয়ে বসেছিল একধারে দেয়ালে পিঠ দিয়ে, দ্বিজোত্তম তার দিকে তাকিয়ে প্রায় হাসির গলায় বললেন, এবাড়িতে—ঢুকতে না পেলে চৌরঙ্গীতে না-হোক, বাসা একটা করে নেবার ক্ষমতা তোর ছোড়দার হবেই, কী বলিস রুবি ?···তাতে আমারই লাভ। তুই যখন শ্বশুরবাড়ি চলে যাবি, তখন আমি গৌতমের বাড়ি চা খেতে যাবো।···

আমার জন্যে কী ? চা তো তোমায় মা খাওয়ান।

তখন কি আর খাওয়াবেন ? হয়তো মুখই দেখবেন না।

বলে হেসে ওঠেন দ্বিজোত্তম।

সুব্রত অনুভব করছে, বাড়িতে কিসের যেন একটা গুঞ্জন চলছে। মেজ-বৌদির মুখে চাপা হাসির আভাস, মার মুখে আহ্লাদের আর দৃঢ় সংকল্পের

একটা আশ্চর্য সমন্বয়।...বাড়িতে কিছু অচেনা লোক আসছে চা মিষ্টি খেয়ে যাচ্ছে, আবার মা হঠাৎ হঠাৎ দু'দিন মেজছেলে আর বৌকে নিয়ে কোথায় যেন ঘুরে এলেন।

'কোথায়' জিগ্যেস করায় মা যথার্থ উত্তরটা এড়িয়ে বললেন, এই এখানে কাছেই।'

ব্যাপারটা সন্দেহজনক।

একদিন মিলিদিকে ধরে বসল, বাড়িতে যেন একটা ষড়যন্ত্রের চাষ চলছে মনে হচ্ছে মিলিদি! ব্যাপারটা কী বলতো?

মিলিদি হাসি চাপা মুখে বলে, ক্রমশ্য প্রকাশ্য।

ঢং ছাড়ো। তুমি নিশ্চয় জানো।

জানিই তো।

বল শীগগির!

ইস! বয়েই গেছে।

বুড়ো বয়েসে চুলটানা খেতে চাও?

ভারী সাহস যে দেখছি। টান না একবার।

সুব্রত ওই খাটের ধারে বসে পড়ে বলল, দেখো মিলিদি, তুমি অন্তত আমার পক্ষে থাকো। মনে হচ্ছে ষড়যন্ত্রটা যেন আমারই বিরুদ্ধে।

তবে তো ধরেই ফেলেছিস। পিসিমা স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল খুঁজে তোর জন্যে একটি সুন্দরী সুলক্ষণা, সুশিক্ষিতা সুগায়িকা কন্যা জোগাড় করে ফেলেছেন, এখন শুধু একদিন তোর টোপর পরে যাত্রা করার অপেক্ষা।

ইয়াকি না কি?

সুব্রত তেড়ে উঠে বলে ওঠে, এতো সস্তা?

সস্তা কি রে? বললাম না যতদূর সম্ভব মহার্ঘ কন্যা! মানে দারুণ দামী মেয়ে।

রেখে দাও তোমার দামী! রোজগারের বালাই নেই এখন ওসব ফালতু কথা শুনতে চাই না।

কেন রে বাপু? যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে তো একটা লেক্‌চারারের পোস্ট

পেয়েছিস ?

থামো। তাতেই সব হবে ?

বাঃ। তা আমায় ধমকাচ্ছিস কেন ? দূত অবধ্য জানিস না ? এই নে ছবি দেখ। দেখলেই বদলে যাবে মতটা !

মিলি নিজের বালিশের তলা থেকে টেনে বার করল একটা স্টুডিওর খাম তার থেকে বার করল একটি মেয়ের ছবি ছাখ।

তোমরা ছাখো ! বিয়েটা যখন তোমরাই করবে।

আমরা ? হি হি হি।

মিলি হেসে গড়িয়ে পড়ে, আমাদের মধ্যে কে ? পিসিমা ? আমি ? দেবুদা ? সুজাতা ?

সে তোমরা বুঝবে। আমার দ্বারা এখন ওসব হবে টবে না।

সুবুরে ! তোর কবিতার বইয়ের নাম 'শঙ্করমাছের চাবুকই' দে। যা মেজাজ দেখছি।

এতে কারুরই মেজাজ মাখন বুলোনো হয় না।

সুব্রত কড়াগলায় বলল, নীচে তো কাউকে দেখলাম না, এঁরা সব গেছেন কোথায় বলতে পারো ?

পারি—

বলে ঘাড় হেলায় মিলি।

পারো তো একেবারেই বলে ফেলো না ! আস্তে আস্তে ভাঙছো কেন ?

আচ্ছা বাবা আচ্ছা, জোরে জোরেই ভাঙছি। গেছেন মার্কেটিংয়ে—বিয়ের শাড়ীটাড়ী কিনতে।

ওঃ। এতদূর গড়িয়েছে ? গড়াক। আমার কি ? আমি কেটে পড়ব।

পিছন থেকে হঠাৎ সরস্বতীর কণ্ঠ বেজে ওঠে।

কেটে পড়বে ? তার মানে লোকসমাজে যাতে মায়ের মাথাটা কাটা যায় তার ব্যবস্থা করবে কেমন ?

সরস্বতী কখন এসেছেন কোন্ কোন্ কথা শুনেছেন তা কে জানে। এরা তো নিজেরাই গল্পে মসগুল ছিল।

সুব্রত সেটা বুঝতে না পেরে এই মোক্ষম সময় মাকে পেয়ে 'একহাত নেবার তালে বলে ওঠে ইচ্ছে করে যদি মাথাকাটা যাবার অবস্থা সৃষ্টি কর তো আমি কা করব ?

সরস্বতী দৃঢ়স্বরে বলেন, কেন ? তোমার আপত্তিটা কিসের ? এমন মেয়ে জোগাড় করেছি, হাজারে একটা মেলে না। দেখলে তো ছবি ? শুনলে তো মিলির মুখে সব? বংশও তেমনি উঁচু ! সেটা তো তবু বলিস নি মিলি ?

তার মানে বহুক্ষণই নিঃশব্দে আড়ি পেতেছেন সরস্বতী !

হঠাৎ যেন কানদুটো জ্বালা করে ওঠে মিলির।

অথচ কারণ তো কিছু নেই। বিয়ে সম্পর্কে ছেলের মতামতটা যদি শুনতেই চান সরস্বতী আড়াল থেকে মিলির কী ? তবু কেন কে জানে মিলির কান দুটোয় একটা দাহ ছড়িয়ে পড়ল। তবু মিলি সহজভাবেই বলল, বলব কী ? যা করছে পাজীটা ! কথা বলতেই দিচ্ছে না।

সরস্বতী মিলির গায়ে মাখন বুলিয়ে বললেন, তা' তুই যে বাছা এলোমেলো করে বললি। তুই দিদি, ভালো করে বোঝাবি তো—

হ্যাঁ এই পরিকল্পনা নিয়েই পাত্রীর ফটোটা ভাইঝির কাছে রেখে গিয়েছিলেন পিসি ? ভাইঝি তেমন কুশলতা দেখাতে পারল না। দেখা যাচ্ছে। অতএব নিজেই হাল ধরলেন, বললেন, শ্রীখণ্ডের মল্লিকদের ঘর, তারওপর রূপে গুণে, বিদ্যেয় বুদ্ধিতে—যাকে বলে একখানা দামী মেয়ে !

মা যে অনেকক্ষণ থেকেই উইংসের আড়ালে দাঁড়িয়ে মঞ্চের পাত্রপাত্রীর সংলাপ শুনছিলেন, নিজে মঞ্চে অবতীর্ণ হন নি, এটা বুঝে সুব্রত একটু গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল, তবু সেও সহজভাবের অভিনয় করেই বলল, ভালই তো, দামী মেয়ে রাণীটানী হোন গে যান না। আমায় টানা কেন ?

সরস্বতীও গম্ভীর হলেন।

বললেন, তোমায় টানব না তো কি পাড়ার লোকের ছেলেকে টানতে যাব ? তোমার ভালমন্দ দেখার দায়, আমি ছাড়া আর কার হবে? আমি বলছি এমেয়ে হাতছাড়া করব না। বিয়েতো তোমায় করতেই হবে। তা' বিয়ের বয়েসে বিয়ে করাটাই ন্যায্য ! যেমন মধ্যাহ্নকালে অন্নব্যঞ্জন। না

হলেই অপথ্যি কুপথ্যিতে মন যায়।···মিলি, বাকি ফর্দটা করে রাখিস মা!···

নিচে নেমে গেলেন সরস্বতী, ছুটো মানুষকে নিথর করে রেখে দিয়ে।

আরে এখুনি ছ-মাস হয়ে গেল? এইতো সেদিন—

তা'হল? দিন যায় না ঝড় যায়, বলেই জগদীশ চোখ কুঁচকে বলে উঠলো, এই, শুনেছিস চিত্তটার শয়তানী?

বন্ধুমহলে ছেলের অন্নপ্রাশনের নেমতন্ন করতে এসে জগদীশ অপর এক বন্ধুর 'শয়তানীর' কাহিনী ফেঁদে বসল।···সেই যে শালা হঠাৎ একদিন হাওয়া হয়ে গিয়েছিল মনে আছে তো? আমরা ওর বাড়িতে গেলাম? এখন বুঝছি কেন বাড়ির লোক আমাদের অত হ্যানস্থা করেছিল। রাস্কেলটা তার এক কাজিন দাদার বৌকে নিয়ে ভেগে পড়েছিল। অ্যাতোদিন—

অ্যাঁ! চিত্ত? অসম্ভব।

জগতে সবই সম্ভব হে।—তো এমন আচরণে কি আর বাড়ির লোক ছেলেকে খুঁজে বেড়াবে? না কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে, বাবা চিত্ততোষ, তোমার মা মৃত্যুশয্যায়। শেষ দেখা দেখিয়া যাও। তাতো সম্ভব নয়? তাই শালা কলকাতার বাইরে কোন্ একটা গণ্ডগ্রামে তাকে নিয়ে দিব্যি গা-ঢাকা দিয়ে থেকেছিল অ্যাতোদিন। এখন সেই 'মাল'টিকে আমাদের গৌতমের ঘাড়ে চাপাতে—

ধ্যাৎ! কী গুল ঝাড়ছিস? নেশা ফেশা করেছিস না কি?

ছাখ জগদীশ কখনো বাজে গুল্ ঝাড়ে না।

তাহলে কি সত্যিই মেনে নিতে হবে আমাদের সোনার গৌতম চিত্তটার ছেঁড়াচটি কুড়িয়ে নিয়ে পরতে বসেছে।

বসেছে, বিশ্বস্তসূত্রে না জেনে বলতে আসতাম না।

সেই সূত্রটি কী?

জিগ্যেস করল সুব্রত।

'সূত্র' নয় চাঁদ, একেবারে কাছি। গৌতমের নিজের দাদার স্ত্রী আমার

গিন্নীর বুজুম্ ফ্রেণ্ড। একসঙ্গে পড়েছে। তার কাছেই—

ওঃ। তোর গিন্নী!

ছাখ সুব্রত মেজাজ খচে দিস নি। ভালো কাজে এসেছি। আমার গিন্নী বাজে কথা বলার মেয়ে নয়।···যাক বিশ্বাস না করলি তো বয়ে গেল। দেখিস পরে।

দীপক, নীহার সবিতাব্রত, এরা হৈ চৈ করে উঠলো, অবিশ্বাস কে করছে? তুই-ইতো বললি, জগতে সবই সম্ভব। তা আর একটু ক্লীয়ার কর? গৌতমের তো জলজ্যান্ত একটা বাড়ি আছে। মা বাপ দাদা বৌদি—

চিত্তরও আছে।···যাকগে! পরে সবাই টের পাবি। যাস কিন্তু নিশ্চয়। রবিবার দুপুরে, মনে থাকবে তো, আরে এইতো—ভুলেই গিয়েছিলাম!··· ব্যাটা আমার নিজেই মনে করিয়ে দেবে—

ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে হেসে হাতের ব্যাগ থেকে নিমন্ত্রণপত্র বার করে জগদীশ। সেই চিরাচরিত ন্যাকামি। চিঠির ওপর একটা 'গোপাল হেন' ছেলের ছবি (আসলে কার্ডে ছাপাই থাকে এরকম।) আর তার তলায় আধো আধো ভাষায় লেখা 'লোববার দুপুরে আমি নোতুন বাত খাবো। তোমলা ছবাই আমাল সঙ্গে থাবে। এথো তিন্তু। তোমাদেল থোতা'!

চিঠিখানা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল সবাই। দামী কার্ড! খাওয়াবেও নিশ্চয় ভালো। চাঁদা জগদীশটাই দিব্যি এগিয়ে গেল। এগোনো ছাড়া আর কী?···এইতো মানব জন্মের পরম সার্থকতা।

সুব্রত মুচকি হেসে বলেই ফেলল কথাটা! যাক জগদীশ, নরজন্মের পরম সার্থকতার সুখ পাচ্ছিস তাহলে?

জগদীশ একগাল হেসে বলল, তা' মিথ্যে বলিস নি ভাই। ব্যাটা আবার দু-দিন থেকে 'বাব্বা বাব্বা' করতে শুরু করেছে।···শেষ রাত থেকে ঘুমোতে দেয় না।

চলে যায় আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে।

সুব্রত হাসুক আর যাই করুক, এই জগদীশরাই চিরঅমর চিরঅক্ষয়। যুগে যুগে কালে কালে এরা আছে, থাকবে। বিশ্বচক্রের চাকাখানা চালু

রাখার দায় এদেরই।···এরা মায়ের বাত, বাপের হাঁপানি, গিন্নীর অম্বলশূল, নিজের ব্লাডসুগার, ছেলেমেয়েদের হাঁচি কাসি সর্দি, বাজারে দেনা, পড়শীর শত্রুতা সবকিছু নিয়েই সেই চাকাখানা ঘুরিয়ে চলবে। চলবে অবশ্য ঘানির গরুর মতো ঢিমেতালে। সেই ঘোরানোর তালেই চাকরি করবে, মাষ্টারি করবে, বাজার করবে, সেভিংস ব্যাঙ্কে খাতা খুলবে, ছেলেমেয়ের দলকে টেনে টেনে দাঁড় করিয়ে তুলবে, মেয়ের বিয়ে দিতে পাত্র পক্ষের, আর ছেলের চাকরি জোটাতে কর্তৃপক্ষের পায়ে তেল দেবে, তাদের বিয়ে সাদীতে ঘটা করতে ধার করবে, এবং সে ধার শোধবার আগেই হঠাৎ একদিন চন্দ্রবিন্দু হয়ে যাবে।

আর ন্যাড়া মাথা ছেলের হাতের পিণ্ডি খেতে খেতে। এবং 'ওং মধুবাতা ঋতায়তে' শুনতে শুনতে স্বর্গে যাবে।

একেবারে ছকে বাঁধা জীবন।

ওই ছকের খাঁজে খাঁজে নিজেকে ফিট করে ফেলবার জন্যে, চিরকালই জগদীশরা জন্মে চলবে।···সুব্রত দু'একটা মুচকি হেসে ওদের ঘায়েল করতে পারবে না।

কী করে করবে?

সুব্রতদেরও তো ওদের 'খোতা'র 'নোতুন বাত খাবার' নেমন্তন্নে যোগ দিতে যেতে হয় রঙিন বল, তুলোর হাতি, আর পশমের কুকুর হাতে নিয়ে। যেতে হয় মেয়ের বিয়েতে শাড়ি, ছেলের বৌভাতে টেবল ল্যাম্প আর মা-বাপের শ্রাদ্ধে কীর্তন শোনার প্যালা হাতে নিয়ে।

তবে?

তবে কী করে জগদীশদের নিয়ে হাসা চলে সুব্রতদের? আসল কথা ওদের সুখী সুখী মুখ দেখে হিংসে হয় তাই ব্যঙ্গহাসি হাসে।

জগদীশের ওই আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে চলে যাওয়া দেখে সুব্রতর বোধ-হয় হিংসেই হলো, তবু ব্যঙ্গহাসি হেসে ওকে প্রায় নস্যাৎ করে নিয়ে অন্য-বন্ধুদের দিকে তাকাল।

দীপক আর সবিতাব্রত আবার চিত্তর প্রসঙ্গে ফিরে এসে বলল, চিত্ত

সম্পর্কে একথা বিশ্বাস হয় তোর ?

সুব্রত বলে উঠলো, ওরে বাবা, বিশ্বাস না করে উপায় আছে ? একে জগদীশের গিন্নী, তাতে আবার তার বুজুম্ ফ্রেণ্ড।

কিন্তু হঠাৎ এমন একটা অদ্ভুত কথা পাবে কোথা থেকে ? বলবেই বা কেন ?···বলল নীহার।

দীপক বলল, সেটা একটা কথা।

চিত্ত সম্পর্কে কিন্তু একটা রহস্যের ধোঁয়া ছিলই আমাদের। তবে এ-ধরনের নোংরা নাটকের নায়ক হবে—ভাবি নি।

কিন্তু গৌতমটা ?

ওটা তো একটা ম্যাড়া। দেখিস নি চিত্তর আঙুলের ইসারায় উঠত বসতো ! আরে সে তো স্টুডেন্ট লাইফে। ও বয়েসে ওরকম অনেকেই কাউকে কাউকে হীরো করে বসে। তাই বলে এখন ? ভালো মাইনের চাকরি-বাকরী করছিস।···কনে-টনেও খোঁজা চলছিল—

তাই বুঝি ?

হ্যাঁ হ্যাঁ। আমাদেরই বাড়িওলার মেয়েকে দেখতে এসেছিল একবার ওর বাড়ি থেকে। ফর্সা নয় বলে পছন্দ হয় নি।

এই সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মালটি ফর্সা ?

সেকেণ্ডহ্যাণ্ড কী রে ? বল থার্ডহ্যাণ্ড।

অনুপস্থিত বন্ধু সম্পর্কে এ হেন উক্তি করে হ্যা হ্যা করে হাসতে থাকে দীপক নীহার সবিতাব্রত।

তা 'বন্ধুই' তো বলা হয়ে থাকে এইরকম ক্ষেত্রে। চিরকালই একে অন্যজনকে 'বন্ধু' বলেই পরিচয় দেয়।

আজও আড্ডা থেকে বেরিয়েই সামনে সমীরণ !

গাড়ির মধ্যে বসে আছে।

থামা গাড়ি।

তার মানে সুব্রতকে ঢুকতে দেখেছিল, বেরোবার অপেক্ষায় অনন্তকাল

বসে আছে।

কী মুস্কিল! সুব্রত ভাবল, না দেখার ভান করে পালাই। কিন্তু না দেখার ভান যদিবা করা যায় না শোনার ভান করা যায় কি দু মিটার দূর থেকে?

উঠতেই হলো গাড়িতে।

আর স্টীয়ারিঙে হাত দিয়েই বলে উঠলো সমীরণ, বলেছিলে আমার কথা?

হ্যাঁ সমীরণের 'একটা কথা' রাজদরবারে পৌঁছে দেবার আর্জি করে চলেছে সমীরণ সুব্রতর কাছে।

'কথা' আর কী আবেদন।

একটিবার শুধু দেখা করবার অনুমতি।

না। ক্ষমাটমা চেয়ে ধৃষ্টতা করতে চায় না সমীরণ, শুধু একটিবার দেখতে চায় মিলিকে। এতোবড় অসুখ থেকে উঠলো, কেমন আছে, কিরকম দেখতে হয়ে গেছে এখন, ভীষণভাবে দেখতে ইচ্ছে করছে।

সুব্রতকে ধরবার জন্যে এইভাবে ঘুরে বেড়ায়, বসে থাকে, চলন্ত গাড়ি থেকে নেমে পড়ে।...সুব্রত অবশ্য একটুও উৎসাহ দেয় নি কোনোদিন, দেয় না। আজও দিলো না। বলল, কবরের ওপর বাতি জ্বালাতে এসে আর কী হবে সমীরণবাবু? বলেছি তো, ফর্সা রঙ আর বড় বাড়ি দেখে ভয় পাবে না, এমন একটি কনে আপনাকে আমি খুঁজে দেবো।

সমীরণ বলল, থাক। ও পাগলামী আর নেই এখন সুব্রত। ভাবছি সব বিক্রি-টিক্রি করে দিয়ে বাইরে চলে যাব। সেখানেই সেট্‌ল করব। শুধু তার আগে একবার—

সুব্রত কৌতুকের গলায় বলল, ওঃ। তার মানে, নিরক্ষর গাঁইয়া মেয়ের বদলে মেমসাহেব মেমসাহেব?

নাঃ। তেমন কোনো সংকল্প নেই।

তা একবার দেখে আর কী হবে আপনার?

সমীরণ আস্তে চাকাটা ঘোরাতে ঘোরাতে আস্তেই বলল, কী 'হবে' তা জানি না। কিন্তু ইচ্ছেটা যেন আমায় ভূতের মতো ভর করে বসে আছে। কিছুতেই ঘাড় থেকে নামছে না। তোমার দিদি তো তোমার ফ্রেণ্ড, সাহস

করে একবার বলে ফেলতে পারছ না ?

সুব্রত একটু চুপ করে থেকে বলল, একবার কেন, অনেকবারই বলেছি।

সমীরণ একটু নিশ্বাস ফেলে বলল বলেছিলে ! রাজী করাতে পার নি ?

না মানে তা ঠিক নয়। সিরিয়াসলি নেয়ই না কথাটা। হেসে উড়িয়ে দেয় ? বলে, 'চিতাভস্ম হাতড়ে কী হবে ? মড়ার খুলি ছাড়া আর কি মিলবে ?'

সমীরণ ব্যগ্রভাবে বলল, আমি তো তোমায় বলেছি সুব্রত, কিছু পেতে চাইব এমন বোকামী নেই আমার। শুধু একবার দেখবার ইচ্ছে—

তাও বলেছি।

সুব্রত একটু হেসে বলে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেয়। গান গেয়ে ওঠে, 'আজ তোমারে দেখতে এলাম অনেক দিনের পরে—'

গান !

সমীরণ উত্তেজিত গলায় বলে, এখনো গান গায় ? গাইতে পারে ?

আগের মতো কী আর ? এমনি একটু আধটু। ওই ঠাট্টা ফাট্টা করেই আর কি।···তবে কাল বলছিল—

কী হলো ? থেমে গেলে যে ? কী বলছিল কাল ?

কাল হঠাৎ বলে উঠল, হেসে হেসেই অবশ্য 'লোকটাকে বলিস দেবীদর্শন করতে হলে মন্দিরের পাণ্ডার পারমিশান লাগে সেটা খেয়াল রাখা উচিত। ·· বাড়িটা পিসিমার।

সমীরণের বোধহয় কথাটা বুঝতে একটু দেরী হলো, পরে বুঝল অবশ্য। বুঝেই ব্যাকুলভাবে সুব্রতর ডান হাতটা চেপে ধরে বলে উঠলো, তবে আমায় একবার পিসিমার কাছে নিয়ে চল সুব্রত।

সুব্রত হেসে ফেলে বলল, মন্দিরের দেবতার থেকে পাণ্ডাকে সদয় করা অনেক শক্ত সমীরণদা, তা জানেন তো ?

সমীরণদা !

অনেকদিনের অব্যবহৃত সম্বোধন।

বিবাহবিচ্ছেদের পর মিলি বলেছিল, এই খবরদার আর 'দাদা দাদা' করবি না।

বাঃ তাহলে কী বলব ?

বলবি আবার কী ? দরকারই বা কী ? আর যাবি না কি ওর বাড়ি ? দেখা ফ্যাকা হলে রাস্তার লোকের মতো 'বাবু' বলবি। ব্যস !

আজ আবার বলল 'দাদা'।

সুব্রতর মধ্যে যে এতটা মায়া মমতা করুণা সঞ্চিত ছিল, তা সুব্রত নিজেই জানত না। অথচ বলতে হবে সেটার বাজে খরচই হচ্ছে। বিশ্বসংসারে কেউ কি বলবে ওই লোকটা করুণার যোগ্য !

সুব্রত ! তুমি আমায় সমীরণদা ডাকলে।

ডাকলাম বুঝি ? আরে খেয়াল করি নি তো। সুব্রত একটু তুষ্টু হাসি হেসে বলল, মিলিদির বারণ ছিল, শুনলে আস্ত রাখবে না।

বারণ ছিল। ঠিক। এটাই আমার উপযুক্ত। কিন্তু পিসিমাকে ম্যানেজ করতেই হবে তোমায়।

সুব্রত অবশ্য বলেছিল 'কঠিন ব্যাপার' তবে এতটাই কঠিন তা বোধহয় অনুমান করে নি। ছেলের আজি পেশ-এর ভঙ্গিকে ধমকের চোটে উড়িয়ে দিয়ে সরস্বতীদেবী প্রায় দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলে উঠলেন, কী বললি ? এ বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোতে চায় ? সেই পাজী লক্ষ্মীছাড়া হারামজাদা শয়তান।

সুব্রত বলল, মা তোমার কথাগুলো কিন্তু তুষ্টু সরস্বতীর ভাষার কাছ ঘেঁষে যাচ্ছে।

'থাম ! সবসময় ন্যাকরা ভালো লাগে না। দেখতে চায়। একবার শুধু দেখতে চায়. আর কোনো অভিসন্ধি নেই !' এই কথা বিশ্বাস করব আমি ? সঙ্গে ছুরিছোরা আনবে কি অ্যাসিডের বাল্‌ব নিয়ে আসবে গ্যারান্টি আছে ?

কী সাংঘাতিক। এতো সব মনে এসে গেল তোমার ?

এতে তার লাভ ?

বদমাইসদের কিসে লাভ, জানিস তুই ?

আরো কিছুক্ষণ চেষ্টা চালাল সুব্রত তার পর রণে ভঙ্গ দিলো।

সরস্বতীদেবী ঘোষণা করলেন, 'আমার বাড়ির ত্রিসীমানায় যেন আসবার

চেষ্টা না করে সে, এই কথা বলে দিস।'

তারপর ছেলেকে যাচ্ছেতাই করলেন, সেই লক্ষ্মীছাড়াটার সঙ্গে আবার দেখা সাক্ষাৎ করেছে বলে। বললেন খবরদার আর পাজীটার ছায়া মাড়াবি না।

সুব্রত বলল, তোমার হুকুমটা জানাবার জন্যেও তো একবার অন্তত মাড়াতে হবে।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। মাকে হ্যানস্তা করতে পারলেই তো তোর যত আহ্লাদ!

সুব্রত দেখে একটু অবাক হচ্ছে, সেদিন থেকে সরস্বতী আর বিয়ের নাম উত্থাপন মাত্র করছেন না। বাড়ির মধ্যের সেই গুঞ্জনধ্বনিও যেন থেমে গেছে মনে হচ্ছে।··· যদিও মেজবৌদির মুখের চাপা হাসির ভাবটা অক্ষুণ্ণই রয়েছে। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। একটা কটু কথা বলে ফেলে কি মা ছেলেকে ভয় করছেন? তাই আর তাকে ঘাঁটাতে চান না?···এইটাই সম্ভব ভেবেছে সুব্রত।

তা হলে বলতেই হবে সুব্রত নিজেকে যত বুদ্ধিমানই ভাবুক মাকে পড়ে ফেলতে তার অনেক বাকি আছে।

সরস্বতী পঞ্জিকার পৃষ্ঠার দিকে তাকিয়ে দেখছেন, সবে এখন ভাদ্র মাস পড়েছে। তার মানে মাস তিনেকের মতো নিশ্চিন্দি। ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক তিন মাস 'বিয়ে' নেই। অতএব এখন আর ও আলোচনা নিয়ে বাড়িতে আলোড়ন করার দরকার নেই। তলে তলে আয়োজন চালিয়ে যাওয়া হোক, অগ্রহায়ণ পড়লেই ব্যাটাকে একেবারে ক্যাঁক করে চেপে ফেলা হবে। ভাব দেখাবেন, যেন ছেলে তো জানেই, সরস্বতী বিয়ে দিতে দৃঢ় সংকল্প। এই 'হাজারে এক' মেয়েকে তিনি কিছুতেই হাতছাড়া করতে রাজী নন।···গোছগাছ তো চলছে, টের পাচ্ছ না? কই পালিয়ে তো যাওনি। এখন যদি তুমি সেই মতলব কর, লোকলজ্জায় গলায় দড়ি দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না সরস্বতীর।

সুব্রত তার মায়ের মনের অতল গভীরের খবর রাখে না অতএব আপাতত

নিশ্চিন্ত। কিন্তু সমীরণ তার মাথায় এক বোঝা চাপিয়ে রেখেছে। মা যে সহজে রাজী হবেন এমন আশা ছিল না, তবু এতটা ধারণা করে নি। ভেবেছিল মা তর্ক করবেন সমীরণ নামের লোকটা তাঁর প্রাণ-প্রতিমা মিলিকে কী পরিমাণ হ্যানস্থা করেছে, সেইসব কথা তুলবেন, আরো বক-বক করবেন। সে সব দিক দিয়ে গেলেন না তিনি। ভীষণা মূর্তিতে একটি অমোঘ বাণী উচ্চারণ করলেন, বাস।

এখন উপায়টা কী?

মিলির শরণাপন্ন হলো সুব্রত। বলল, একটা উপায় বাৎলাওতো। কিভাবে দেবী সরস্বতীকে প্রসন্ন করা যায়।

মিলি বলল, এতোর দরকার কি? হ্যাংলা লোকটাকে বলে আয়না মন্দিরের দ্বারী দারুণ খেপচুরিয়াস।

দেখো মিলিদি, আমার নিজের মাকে আমি একটা ব্যাপারে কায়দা করতে পারলাম না, বলতে প্রেসটিজ্ পাংচার হবে না?

ও! সেও তো একটা কথা বটে।

মিলি যেন ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে চিন্তিত, এই ভাবে বলে, তা হলে দুটো দিন ভাবতে দে। দেখি কী উপায় বাৎলাতে পারি।

কিন্তু সুব্রতর কী ধারণা মাত্র ছিল উপায়টা মিলি নিজের হাতে তুলে নেবে?

সুব্রতর দীর্ঘ অনুপস্থিতির সময়ে সরস্বতী ভাবীবধূর জন্য কেনা শাড়ি সম্ভার নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলেন। কতগুলো দেওয়া হবে সেটি নিভৃত চিন্তার মধ্যে থাকলেই ভালো। কারণ সুজাতা যা সংসার অনভিজ্ঞ মেয়ে হয়তো বলে বসবে, 'ওমা, ওর থেকে আবার রেখে দেবেন কি? পছন্দ করে কিনলেন নতুন বৌয়ের নাম করে। সবই দিয়ে দিন তত্ত্ব সাজিয়ে।

কথাটা ঠিক, সবই সরস্বতীর পছন্দেই কেনা। মেজবৌমাটিকে সব সময় নিয়ে গেছেন বটে, 'তোমাদের একেলে পছন্দ তুমিই ভালো বুঝবে?' বলে কিন্তু কেনার সময় তাঁর নিজের মতটাই প্রাধান্য পেয়েছে। পছন্দ হয়ে

যাওয়ার খাতিরে অনেকই কেনা হয়ে গেছে। এখন বিবেচনার প্রশ্ন। দেবেন বৈকি, বৌকেই দেবেন, তবে একসঙ্গে নাই দিলেন। কত উপলক্ষ আসবে, তখন বার করবেন।···সেই বিবেচনায় একা আলমারী খুলে খাটের উপর নামিয়েছেন সব।

হঠাৎ সামনের দরজায় কার ছায়া পড়ল।

থমকে তাকিয়ে দেখেই হাঁ হাঁ করে উঠলেন, ও-মা এ কি! তুই। তুই নেমে এসেছিস? এইজন্যেই আমি আয়াকে আরো কিছু দিন—আয় মা আয় বোস। ঘরে খাবার জল রাখা নেই বুঝি?

একযোগে হুড়মুড়িয়ে এতগুলো কথা বলে নিয়ে সরস্বতী তাড়াতাড়ি ভাই-ঝিকে ধরে ধরে নিয়ে এসে শাড়ির গোছা সরিয়ে খাটের ওপর বসালেন। বললেন, বোস জল আনি।

মিলি হেসে উঠলো, কী মুস্কিল! কে বলল আমি জল খেতে এসেছি। কেন বাপু ডাক্তার তো নিজেই বলেছে, সিঁড়ি ওঠানামা অভ্যাস করতে। কাল বিকেলেও তো—

আহা সে তো মেজবৌমা সঙ্গে ছিল। একা একা সাহস করাটা ঠিক নয়।

রেলিং ধরে ধরে কচ্ছপের গতিতে এসেছি বাবা।

শাড়ির বাক্সগুলোর দিকে তাকিয়ে—মিলি বলল, এগুলো আবার নতুন কিনলে?

না রে বাছা! আবার কেন? এ সেই আগের কেনাগুলোই। ওপরে গিয়ে তোকে দেখিয়ে দেখিয়ে এনেছি। আর একবার দেখবি ভালো করে?

এ মা, আর একবার দেখতে বসবো কেন? দেখেছি তো। তা তুমি বুঝি আরও একবাব দেখছ ভালো করে? হেসে ওঠে মিলি।

সরস্বতী অবশ্য হাসেন না। বাক্সগুলো ফের আলমারিতে তুলতে তুলতে বলেন, বকিস না বাছা! আমার তো দশবার দেখা। ক'খানা কি কেনা হয়েছে তাই গুণে দেখছিলাম।···সুবো বাড়ি থাকতে তো এসব বার করার জো নেই!

হ্যাঁ ওই এক পাগলা!

বলেই মিলি এই সুতোটাতেই নিজের বক্তব্যটা গেঁথে নেয়। পাগলটা তো আমায় এক জ্বালায় ফেলেছে— ।

সরস্বতী চমকে ওঠেন !

কী আবার জ্বালায় ফেলল সুবো।···গাটা কেঁপে উঠলো যে!···মিলির উপর তাঁর কোনো বিরূপতা নেই, মিলি খাঁটি মেয়ে, সৎ মেয়ে ভালো মেয়ে। সুবোকে নিজের ছোট ভাইয়ের মতোই কিন্তু নিজের ছেলেকেই বিশ্বাস নেই। সর্বদা মিলিদি মিলিদি করে হেদিয়ে পড়া ; দেখলে গা জ্বলে যায় সরস্বতীর। এখনকার সব ছেলেদের এই তো রীতি ! ধাড়ি বয়েস অবধি বিয়ে করবে না, আর কোথায় অমুক বৌদি, অমুক দিদি, এই 'পিসিমা' সেই 'মাসীমা' করে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকবে তার চরণে।···বলবো কি সরস্বতীর এক প্রিয় বান্ধবীর ছেলেই তো জন্মে আর বিয়ে থাওয়াই করল না। আপন বৌদির চরণেই মাথা মুড়িয়ে বসে আছে।·· কী না দাদা কম রোজগেরে ছেলেমেয়ে গোটা কতক হয়ে বসে আছে বেচারী বৌদির হাড়ির হাল, তাই তিনি তাঁর সর্বস্ব ওজোড় করে দাদার সংসার পুষছেন। বলে একি আর দাদার মুখ চেয়ে ? না ভাইপো ভাইঝিগুলোর মুখ চেয়ে ? হুঁঃ! বুঝতে আর বাকি নেই সরস্বতীর। এই সব দেখে শুনেই না ছোট ছেলের বিয়ের জন্য এতো ব্যস্ত হয়েছেন। যার জিনিস সে এসে বুঝে নিলে সরস্বতীর আর দুশ্চিন্তা থাকবে না। সরস্বতী ওই দুর্ভাগা ভাইঝিটাকে বুকে করে বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটিয়ে দেবেন।

এই নিশ্ছিদ্র বুনুনির মধ্যে আবার কিসের জট ? সুবো আবার মিলিকে কী জ্বালায় ফেলল ? শঙ্কিত চোখে তাকিয়ে বললেন, কেন ? কী করেছে সুবো ?

মিলি হেসে উঠে বলে, আহা এমন শাদা হয়ে যাবার কোনো কারণ নেই। জ্বালা এই ও নাকি তোমার কাছে কী আর্জি জানিয়েছিল, তুমি রাজী হওনি হবার কথাও নয় অবশ্য। যাকগে এখন আমায় ধরেছে তোমায় রাজী করাতে।

সরস্বতী প্রথমটায় ভাবেন এটা তা হলে বিয়ে বন্ধ করানোর আর্জি। তবু

গম্ভীরভাবে বললেন, কখন কী আর্জি করল ? মনে পড়ছে না তো। কী ব্যাপার ?

আর বল কেন ? ওর গুণের অবতার প্রাক্তন জামাইবাবু নাকি ওর কাছে বায়না ধরেছেন একবার এ বাড়িতে ঢোকবার পারমিশান জোগাড় করে দিতে—।

ওঃ !

সরস্বতী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভাইঝির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। ভাবটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না ! তাই নীরসকণ্ঠে বললেন, তা জবাবটা তোকে বলে নি ?

আহা বলেছে বলেই তো তোমার দরবারে আসা।

সরস্বতী তীক্ষ্ণ গলায় বলে ওঠেন, তোকে দিয়েছে এই কাজের ভার? সেই বায়না রাখতে হবে ? সেই নচ্ছারের বংশের নচ্ছারের আবার কী মতলব চাগছে ভগবানই জানেন। ভাইয়ের আবদারে পড়ে তুই আবার তার নাম মুখে আনতে বসেছিস মিলি ?

মিলি সমানভাবেই হেসে হেসে বলে নাম তো মুখে আনি নি। তোমার জামাই'ও বলি নি বাছা, ওই সুবো গাধাটার সঙ্গে যখন আবার এতো ভাব, তখন ওর সম্পর্কটাই ধরলাম। নইলে চেনাব কী করে ?

সেই পাজার সঙ্গে সুবোরই বা আবার কিসের সম্বন্ধ ? মুখ্যুটাকে বলে দিস পিসি বলেছে সে যদি এ বাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে চায় তো পুলিশে ধরিয়ে দেবো।

মিলি অম্লান মুখে বলে আমিও তো বলেছি পিসি ! গুণ্ডা লাগিয়ে মার লাগাবার কথাও বলেছি। কিন্তু সুবোগাধাটা একেবারে নাছোড়বান্দা ! তাই বলছে—আমি তো এখন নীচে নামতে পারছি, একেবারে গেটের মুখ থেকে গাড়িতে চেপে যদি—

তুই ? তুই গাড়িতে চেপে কোথায় ?

সরস্বতীকে যেন কে ধরে ছুঁড়ে অকূল পাথারে ফেলে দিয়েছে। হতচকিত গলায় বলে ওঠেন কোথায় যাবি ?

মিলি একেবারে সমস্যা উড়িয়ে দেওয়া সহজ গলায় উত্তর দেয়, যাব আবার কোথায় বাড়ির মধ্যে যখন নাক গলাতে আসতে পারছি না, বাড়ির বাইরে গিয়ে কোথায় একবার দেখা দিয়ে ধন্য করে আসা, এই আর কি !

সরস্বতী এই সহজ ভঙ্গিটার মধ্যে যেন নিজের সর্বনাশের ছায়াকে উঁকি মারতে দেখেন।···এও কি সম্ভব যে মিলি সেই লক্ষ্মীছাড়াকে—ভয়ঙ্কর একটা কুটিল সন্দেহ মনের মধ্যে পাক দিয়ে ওঠে, এসবই বানানো কথা নয়তো ? সরস্বতীর ছেলেই আগুন নিয়ে খেলতে বসছে না তো ? বাড়ির মধ্যে মায়ের চোখের সামনে 'মিলিদি মিলিদি' করে আর তেমন গড়াতে পারছে না বলে, ছলছুতো করে বাড়ির বাইরে গিয়ে-- কিন্তু তাই বা অঙ্কে মিলছে কই ? আগে তো সেই বদমাসটাকেই আনতে চেয়েছিল। নাঃ ! ব্যাপার সেইটাকে নিয়েই সুবোর আদিখ্যেতায় পড়ে তার 'মিলিদি' একেবারে আত্মসম্মান জ্ঞানও ভুলতে বসেছেন।

তিক্ত গলায় বলে উঠলেন সরস্বতী, সেই বদমাসটা আবদার করেছে বলেই, তুই যাবি তার সঙ্গে দেখা করতে ? মুখে আনতে পারলি কথাটা ?

মিলি বলল, ওমা ! 'দেখা করতে' কে বলেছে ? বলতে পারো দেখা দিতে। ফুটপাথের ধারেটারে কোথাও দাঁড়িয়ে থাকবে হা করে, আমি হি হি হি গাড়ি চড়ে নাকের সামনে দিয়ে স্রেফ একটা চক্কর মেরে হি হি হি। সুবু থাকবে সঙ্গে।

সুবু থেকে কী করতে পারবে শুনি ! সরস্বতীদেবী হঠাৎ চণ্ডী মূর্তিতে পরিণত হন, যদি ফস্ করে মুখে একটা অ্যাসিডের বাল্‌ব ছুঁড়ে মারে ? যদি ছুরি বার করে ?

মিলি কিন্তু এই চণ্ডীর সামনেও হেসে ফেলে বলে পিসিগো তুমি যে লোকটাকে একেবারে হিন্দি সিনেমার ভিলেন বানিয়ে ছাড়ছ। ওসব এতো সোজা ? ওসব কিছু না, সুবুকে নাকি বলেছে প্রায় মরে গিয়ে আবার বেঁচে উঠে কেমন একখানা দ্রষ্টব্য হয়েছি আমি সেটাই দেখতে ইচ্ছে-- এখন সুবুর অবস্থা সঙ্গীন। প্রেস্‌টিজ পাংচারের জোগাড় !

ওঃ ! সুবোর প্রেসটিজ যাবার ভয়ে তুমি নিজের প্রেসটিজ খুইয়ে ? মিলি !

পাগলামী করিসনে।

আহা এ আর পাগলামী কি ? এমনিতেও তো আমি এবার গাড়ি চেপে চেপে একটু একটু বেরোবো। বলেছে না ডাক্তার ? মনে কর তেমনি বেরোলাম।

সরস্বতী বজ্রগর্ভস্বরে বলেন তার মানে তুমি সেই বেহায়া ছোটলোকটার আবদার রাখতে যাবেই ঠিক করেছ ?

কী করবো গো পিসি, নাকি এমন হ্যাংলামো দেখিয়েছে—যে—এড়ানোটা অসম্ভব।

উঠে দাঁড়ায় মিলি।

যেন বক্তব্যের সমাপ্তি ঘোষণা অন্তে মাইক সরিয়ে রাখা।

কিন্তু সরস্বতী কি এতেই পরাজয় স্বীকার করবেন ?

যা মুখে আসে বলে বসবেন না ?

বলবেন না সেই লোকটার সঙ্গে আর এখন কথা রাখার দায় কিসের ? সম্পর্কটা কী ? বিয়েটাই যখন ভাঙাভাঙি হয়ে গেছে, আইনের চোখে তো সে মিলির কাছে পরপুরুষ। মিলি এতো বুদ্ধি ধরে, আর এটা বুঝতে পারছে না কোনো দুরভিসন্ধি নিয়েই সে এই একবার দেখা করার জন্যে হেদোচ্ছে। বলতে বলতে রেগে কেঁপে হাঁপাতে থাকেন সরস্বতী।

মিলি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, দাঁড়িয়ে পড়ল। একটু ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, বুঝতে আবার পারছি না ? খুব পারছি পিসি। নির্ঘাৎ সেই ভাঙা বিয়েটা আবার জোড়া লাগাতে হাতে পায়ে ধরতে চায়। বেহায়া নির্লজ্জ, হ্যাংলা চক্ষুলজ্জাহীনেরা কী না পারে ?

সরস্বতীকে স্তব্ধ করে দিয়ে স্বচ্ছন্দভাবে একটা হাই তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মিলি। যেন পিসিকে ধরে শানের উঠোনে একটা আছাড় দিয়ে।

এখন সরস্বতীর বুকের মধ্যেটায় যেন কে করাত চালিয়ে চিরতে বসেছে।

সরস্বতী দেখতে পাচ্ছেন মিলির ওই ঘর থেকে চলে যাওয়াই সরস্বতীর জীবন থেকে চলে যাওয়া। আর মানে সরস্বতীর ভবিষ্যতের ছবিটার সব

রং মুছে যাওয়া! সরস্বতীকে আর তাঁর নিজের ঘরের পাশে কারো জন্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করতে হবে না। সরস্বতীর শেষ জীবনে একখানি চির-প্রিয় স্নেহকোমল মুখ তাঁর রোগশয্যা পাশে অহর্নিশ উৎকণ্ঠ দৃষ্টি মেলে জেগে বসে থাকবে না।···আর···আর বার্ধক্যে শক্তি ফুরিয়ে যাওয়া সরস্বতীর 'নিজের' বলতে একটু পায়ের তলার মাটি থাকবে না। পৃষ্ঠবল বলে কিছু থাকবে না।···শেষ পর্যন্ত সরস্বতীকেও সেই পাঁচটা গিন্নীর মতোই কর্তৃত্ব হারিয়ে পরের মেয়ের দয়ার ওপরই নির্ভর করতে হবে।

করাতটা যেন দ্রুত চালিয়ে চলেছে। তীক্ষ্ণধার করাতটা।···সেই যন্ত্রণায় সরস্বতী চেঁচিয়ে বলে উঠতে চাইলেন কী নিঘিন্নে! কী নিঘিন্নে! কুকুরের মতো একবার 'তু' করে ডাকতেই ছুটে যাচ্ছিস তুই? সে হ্যাংলা, না তুই হ্যাংলা?

কিন্তু বলে উঠতে পারলেন না। ডুকরে কেঁদে উঠে বললেন, কী নিষ্ঠুর! কী নিষ্ঠুর।

অথচ সরস্বতীর তো কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়ারই কথা। তাঁর ছেলেটাকে আগলে বেড়াবার দায়টা তো থাকবে না। নাঃ সেই অবান্তর অলীক কথাটা আর মনে পড়ছে না সরস্বতীর। তাঁর শুধু মনে হচ্ছে তিল তিল করে গড়ে তোলা তাঁর আশার প্রাসাদটা কে যেন ধূলিসাৎ করে দিলো।

আশাভঙ্গ বড় ভয়ঙ্কর জিনিস।

চিরস্নেহময়ী পিসি তাঁর চির আদরের ভাইঝির উদ্দেশে মনে মনে বলে চলেন, নির্বোধ লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে তুই কি ভাবছিস ভাঙা গেলাশ জোড়া লাগিয়ে আবার তুই জল খাবি? সুখী হবি না, কক্ষনো সুখী হবি না। ···এই বলে রাখছি আমি।

কিন্তু মিলি নামের মেয়েটা কি একটা ভাঙা ঘর আবার জোড়াতালি দিয়ে জুড়ে নিয়ে সুখী হবার বাসনাতেই এমন নিষ্ঠুর হতে পারল? না—একটা আস্ত সুস্থ সুখের ঘর ভেঙে পড়বার ভয়েই কণ্টকিত হচ্ছিল না সে? অথচ আশঙ্কার সত্যই কিছু ছিল না, তবু হনুমানের ল্যাজের আগুনেই তো সোনার লঙ্কা ধ্বংস হয়।···নিজেকে যারা ভাবী বুদ্ধিমান ভাবে, তাদের

মতো নির্বোধ আর কে আছে? পিসিকে দুঃখ থেকে মুক্তি দেবার উপায় মিলির হাতে ছিল না, তাই অন্য একটা দুঃখ চাপিয়ে সেটা চাপা দিলো। তবে সেই লোকটাকে নাকি আর দেখলে চেনা যায় না। নাকি একেবারে ঝুলে পড়েছে। ভাবা যায় না।

টুনুকে বিয়ে করবার অনুরোধ করে চিত্তই একান্ত আগ্রহে আর চেষ্টায় গৌতমের দ্বিধা ভাঙিয়েছে, গৌতমের মনের মধ্যেকার সঙ্কোচের জড়তাকে দূর করে সেখানে একটা যুবক পুরুষের চেতনা এনে দিতে সক্ষম হয়েছে, গৌতম যখন শিথিলভাবে বলেছে, 'আমার মা আছে, বাপ আছে, সমাজ সংসার আছে—।

তখন চিত্ত তার সেই দুর্বলতাকে ঝেড়ে ফেলে অধুনিক জগতের দিকে চোখ ফেলতে বলেছে।

তবুও গৌতম আবার যখন বলেছে, মুস্কিল এই—মা সাংঘাতিক অবুঝ—। চিত্ত সে কথাকে উড়িয়ে দিয়ে বলেছে, ওরে শালা মায়েরা তাই হয়। 'মা' শব্দটার আর একটা অর্থ ই হচ্ছে 'অবুঝ'। বিশেষ করে ছেলেমেয়ে ওঁদের অনুমতি না নিয়ে প্রেমটেম করতে বসলে। তেমন খবর পেলেই বলে, 'বিষ খাবো গলায় দড়ি দেবো, মুখ দর্শন করবো না' হ্যানো ত্যানো। তারপর সব ঠিক। যেমন বিয়েই করুক, বাপ যদি বা কঠোর কঠিনের ভাব দেখায়, মা সেই স্নেহবিহ্বল করুণা ছলছল। প্রথম প্রথম ভালোমন্দ কিছু রাধলেই চুপিচুপি সাপ্লাই করবে, তারপর একে ওকে দিয়ে পুজোর কাপড় পাঠাবে, ওপন্যাসক্রেট আর কি। যেন কর্তা জানতে পাচ্ছেন না। তারপর যেই অপরাধী পক্ষে একটি 'ইস্যু' হলো ব্যস একেবারে বাঁধ ভাঙা নদী! কর্তাও তখন নাতি নিয়ে বিগলিত। কাজেই ও নিয়ে মাথা ঘামাসনে।

অথচ আশ্চর্য গৌতম যখন আমায় ভাবতে দুদিন সময় দে বলেই দুদিন না হতেই সংকল্পে স্থির হলো, আর টুনু সেই স্থিরতা শুনে স্থির গলায় বলল, 'ঠিক আছে'। তখন চিত্তর মধ্যে এক অস্থির সমুদ্র গর্জন করে উঠলো। সে সমুদ্র রাগের, অপমানের, জ্বালার।

চিত্ত বুঝতে পারছে না কিসের এই জ্বালা তবু অসহ্য লাগছে। চীৎকার করে উঠে আকাশে বাতাসে থুতু ছুঁড়তে ইচ্ছে করছে, মুঠো মুঠো ধুলো নিয়ে ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে যার তার গায়ে, পৃথিবীকে ধিক্কার দিয়ে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে ধিক্ ধিক্।

কিন্তু এসবের কিছুই করা যায় না। যায় শুধু নিজের চুলের মুঠিটা চেপে ধরে নাড়া দিতে। যেটা তার অভ্যাস। অসহিষ্ণুতা প্রকাশের এই ভঙ্গিই চিত্তর। শুধু অসহিষ্ণুতার তারতম্যে ভঙ্গিটার প্রাবল্য অথবা মৃদুতা।

আজকের ভঙ্গিটা প্রবল প্রাবল্যের।

পঞ্চু উঠোনের বেড়া শক্ত করছিল।

পঞ্চুর পায়ের কাছে কতকগুলো কচার ডাল, আর বেশ কিছু পাকানো মতো শুকনো বুনোলতা। এগুলো দিয়ে দড়ির কাজ করা সম্ভব। পঞ্চু আবিষ্কারের খাতায় তালিকা ক্রমশই দীর্ঘ হয়ে চলেছে। ডুমুরের রসের কার্যকারিতাও যেমন টুনু জানত না, তেমনি জানত না টুনু ডুমুর কাঠ উনুনে জ্বালতে নেই, কারণ ওতে 'হোমযজ্ঞি' হয়।

পঞ্চু তাই নিত্যদিনের ডুমুরের ডালগুলোকে শুকিয়ে উঠোনের একধারে পুঁতে পুঁতে নীচুমতো দিব্যি একখানা মাচা বানিয়ে পাতালতা দিয়ে ছেয়ে তার উপর তুলে দিয়েছে তার সাধের শশাগাছটি। যেন আরামে খাটে শুয়ে লালিত হচ্ছে শিশু শশাগুলি। বাইরে থেকে যাতে কোনো আততায়ী এসে এই শিশুগুলিকে ধ্বংস না করে বসে। তাই পঞ্চুর এই বেড়া শক্ত করা। কাজ করতে করতেই পঞ্চু চিত্তর এই চিত্তচাঞ্চল্যের প্রকাশ দেখতে পাচ্ছিল, হঠাৎ বিরক্ত গলায় বলে উঠলো, ওটা কী হচ্চে? চুলগুলান উবড়ে আসবে যে।

টুনু দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসে বোধকরি পঞ্চুর কেরামতি দেখছিল। ওর কথায় বলে উঠলো, ওমা, তুই জানিস না, দাদাবাবুর সেই দিল্লী বোম্বাই না কোথাকার আপিসে ন্যাড়ামাথা অফিসার সাহেব চেয়েছে। তাই তো চুল উপড়োতে লেগেছে দাদাবাবু।

চিত্ত দাওয়ার সামনে নীচের মেটে জমিটুকুতে পায়চারি করছিল, একবার

শুধু দাঁড়িয়ে পড়ে তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল টুনুর অতাপ ভঙ্গী, তারপর আবার যা করছিল তাই করতে লাগল।

টুনু বলল, পঞ্চু তোকে কি একটু সাহায্য করব?

পঞ্চু অবজ্ঞার গলায় বলল, থাক, পঞ্চুরে আর কারো সায়াজা করতি হবে না। আপন আপন দেহোশরীল ঠিক রাকলেই পঞ্চাকে অনেক সায়াজ্য করা হবে।

তবে আর কী করা। 'দেহো শরীল' ঠিক রাকতে তাহলে শুয়েই পড়িগে কী বল?

পঞ্চু হাতের কাজ থামিয়ে বলে ওঠে, ক্যানো শুয়েই পড়তে যাবে ক্যানো? এই ভরদুকুরে ভেজামাতায় শুলে বুজি শরীল স্বাস্থ্যের উপকার হয়? এই যে দাদাবাবু অ্যাকোনো অব্‌দি চান করচে না, অকারণ ঘুরতেচে, এডা ভালো?

তোর দাদাবাবু বিদ্বান বুদ্ধিমান লোক, যা করছে তা ভালো না তো কি মন্দ হবে রে?

তোমরা যা বলবে তাই।

বলে পঞ্চু আবার নিজের কাজে মনোনিবেশ করে।

চিত্ত হঠাৎ দাওয়ায় বসে পড়ে, কেমন যেন একটা হিংস্রগলায় বলে উঠল, পঞ্চুকে বলেছ?

ওমা বলব না? তো বম্বে না দিল্লী সেটা তো আমি নিজেই জানি না। তুমি বললে, হেড অফিস বম্বেয়—আবার বলছ, থামো! ওকথা হচ্ছে না।

তবে?

ন্যাকামি রাখো। বলা হচ্ছে বিয়ের কথা!

টুনু এখন গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, সানাই বাজলেই জানতে পারবে।

চিত্ত আর একবার আহত জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর খাপছাড়া ভাবে বলে উঠলো, আমায় সামনের সোমবারেই জয়েন করতে হবে।

ও মা! তা হলে তো কালই বেরোতে হয়। টিকিট ফিকিট হয়েছে?

তোমার সে চিন্তার দরকার নেই। কথা হচ্ছে তোমাদের বিয়ের রেজিস্ট্রির

ব্যাপারটা—।

তার জন্যেই বা তোমার এতো চিন্তার কী আছে ? তোমার বন্ধু তো খোকা নয় ?

ওতে সাক্ষীর দরকার হয় সেটা নিশ্চয় জানো ?

জানি বৈকি। সে জোগাড় হয়েই যাবে। আরো তো বন্ধু টন্ধু আছে।

ওঃ। তাই তো। এখন কত বন্ধু জুটবে।

চিত্ত উঠে পড়ে দড়িতে ঝোলানো তোয়ালেটা টেনে নেয়।

টুনুও উঠে পড়ে, চিত্তর খুব কাছে সরে এসে মৃদু দৃঢ় গলায় বলে, একটি অনুরোধ, পঞ্চুকে তুমি কিছু বলতে যেসো না।

ঠিক এই মুহূর্তে ওই কথাটাই ভাবছিল চিত্ত। মনে মনে কথাটা তৈরীও করে নিচ্ছিল, 'তোর দিদির যে বিয়ে রে পঞ্চা! বরটিকে জানিস তো ? গৌতম দাদাবাবু! তা তোর চিন্তা নেই তোকে কলকাতায় নিয়ে যাবে ওরা—।'

এই সময় টুনুর নিষেধবাণী!

চিত্ত একটু থতমত খেয়ে গেল।

টুনু কি তার মুখ দেখে মনের মধ্যে উচ্চারিত কথাগুলো শুনতে পেল ? তবু সামনে নিয়ে প্রায় ব্যাঙের গলায় বলল, ওকে না বলে হবে ?

সে আমি বুঝবো।

ওঃ। তা বটে! চিত্তশালা তো এখন স্টেজ থেকে আউট!

টুনু আরো দৃঢ় স্বরে বলল, চান করগে!

চিত্তর অন্তর্দাহের খবর কি টের পায় না টুনু ? টুনুর কি এ আশঙ্কা ছিল না ? ছিল বলেই তো, টুনু দ্বিধামাত্র না করে এককথায় বলেছিল ঠিক আছে। না বলে কী করবে ? লোকটাকে বাঁচাতে হবে তো ? সারা জীবন মরা-বাঁচার মাঝখানে ঝুলিয়ে রাখলে তো চলবে না।

'ঠিক আছে' শুনেই চিত্তর মুখটা কী অসম্ভব লাল হয়ে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল চোখ দিয়ে রক্ত ফেটে বেরিয়ে আসবে। মিনিটখানেক তেমনি থেকে চিত্ত বলে উঠেছিল বাঃ। এইতো বুদ্ধিমানের কথা। এক কথায় রাজী!

নীরেট শালাকে রাজী করাতে বিস্তর খাটতে হয়েছে।

টুনু নিজেকে পাথর করে ফেলেছিল, প্রায় হেসে বলেছিল, ওটা লোক দেখানো চক্ষুলজ্জা!

চিত্ত হঠাৎ চটিটা পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।

তারপর এই ক-দিন কী অস্থিরতাই করছে। টুনু ভাবল, চোখে দেখা কষ্ট। ও রেলগাড়িতে চড়ে বসলে আমি বাঁচি।

চিত্ত খেতে বসলে কথাটা বলেই বসল টুনু। তুমি রেলগাড়িতে চড়লে, গাড়ি ছাড়ল। দেখে আমি বাঁচব!

চিত্ত আধ খাওয়া অবস্থায় জলের গ্লাশে হাত ডুবিয়েছিল, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ওঃ! সি অফ করতে হাওড়ায় যাবে বুঝি?

ওমা! তা যাব না? তুমি সত্যি দিল্লী গেলে, না বিবাগী হয়ে বনে চলে গেলে, দেখতে হবে না?

বিবাগী! তার মানে? হঠাৎ বিবাগী হওয়ার কথা উঠছে যে? কেন কেন উঠছে?

টুনু হেসে বলল, এখনো আমার কথায় কারণ খোঁজো তুমি? পঞ্চু বলে শোন না, ছাগলে কী না খায়, আর পাগলে কী না কয়।

পরদিন সকালে চিত্ত যখন চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে, টুনু ডাক দিলো, পঞ্চু দোরটায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে আয়রে।

চিত্ত দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, তালা লাগিয়ে মানে?

মানে আবার কী? আজ তো আর ফেরা হবে না, ঘর খোলা পড়ে থাকবে? কুকুর-বেড়াল ঢুকবে হয়তো! আয়রে পঞ্চু!

পঞ্চু বেরিয়ে এলো।

পরণে মেলাতলায় কেনা নতুন শার্ট প্যান্ট, পকেটে কটা ফুল গোঁজা, চুলে টেরি, মুখে একমুখ হাসি।

টুনু বলে ওঠে আরে বাস! আর তো পঞ্চু বলা চলবে না। এ যে একেবারে পঞ্চাননবাবু।

ধ্যাৎ! নিজেই বলা হলো পঞ্চু সাজগোজ কর। তামাসা করলে খুলে ফেলে

থোবো বলচি !

আরে বাবা হয়েচে হয়েচে, আর রাগে কাজ নেই। চল। দুর্গা দুর্গা।

চিত্ত বলল, তোমরা কোথায় যাচ্ছ ?

টুনু বলল, যেদিকে দু চক্ষু যায়।

চিত্ত বিদ্রুপের গলায় বলল, দরজায় তালাচাবি লাগিয়ে ?

পঞ্চু বিরক্ত গলায় বলল, দাদাবাবু যেন আকাশ থেকে পড়ল। তোমাকে টেরেনে তুলে দিতে যাচ্চি না আমরা ?

পাগলামী রাখো টুনু। ফরনাথিং এতখানি হাঁটার কোনো মানে হয় ?

ফরনাথিং না হতেও পারে।

নজরপুর থেকে একা ফিরতে তোমাদের—

এই দেখো ! নজরপুর থেকে ফিরতে যাব কেন ? বললাম না রাতে ফেরা হবে না।

কী আশ্চর্য ! কী করতে চাও তাহলে ?

তোমায় দিল্লীর গাড়িতে চড়িয়ে দিয়ে নজরছাড়া না করা পর্যন্ত তোমার ঘাড়ে চেপে থাকতে চাই।

পাগলামী কোরো না টুনু। আমার ট্রেন তো সেই রাত্রে, ফিরবে কী করে ?

সে যা হয় হবে। ও নিয়ে ভেবো না।

ও তাওতো বটে, তোমার জন্য আর ভাববার দরকার নেই আমার। চিত্ত মাথাটা ঝাঁকিয়ে বিপন্ন গলায় বলল, সারাটা দিন আমি কোথায় না কোথায় ঘুরবো, কি করব না করব, তোমাদের নিয়ে কী করব বল তো ?

এ যে এক অদ্ভুত খেয়াল তোমার।

টুনু একটু বিচিত্র হাসি হাসল।

অদূরবর্তী অসহিষ্ণুমূর্তি ছেলেটার দিকে তাকাল। তবু একটু কাছাকাছি সরে এসে বলল, সারাটা জীবন ধরে আমায় নিয়ে কী করবে, ভেবে ভেবে আর ভেবে না পেয়ে পেয়ে শেষ অবধি পাগলা হয়ে যেতে, তার হাত থেকে তো রেহাই পেলে ? সেই বাবদ না হয় মাত্র আর একটা দিন আমার বোঝা বয়ে বেড়াও চিত্ত।

কেটে গেল সারাটাদিন।

এসে গেল স্টেশন যাবার সময়।

কলকাতায় এসে পৌঁছেই টুনু চিত্তকে দোকান দোকান ঘুরিয়ে মেরেছে।··· বলেছে, বাঃ কতদিনের জন্যে চলে যাচ্ছ, আমার যা কিছু দরকার কিনে দিয়ে যাবে না?

আর দোকানে গিয়ে জোর করে কিনিয়েছে চিত্তর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। এইসব তোমার 'দরকারের জিনিস?' চিত্ত রেগে রেগে বলেছে এই শার্ট গেঞ্জি, রুমাল তোয়ালে, মোজা টাই সাবান তেল সুটকেস আমায় বোকা বানানো!

টুনু ওর মুখের দিকে একটু গভীর দৃষ্টি ফেলে বলেছে, বোকা আবার 'বানাতে' হয় নাকি তোমায়? না হলে বলে বলে বোঝাতে হয় হ্যাঁ এগুলো আমারই দরকারের!

তোমার বিয়ের জরির শাড়িটা আমার কিনে দিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। সব টাকা ফুরিয়ে দিলে।

ওটা না হয় এ জন্মের মতো পাওনা থাকল।

তার মানে?

আঃ! আবার তুমি আমার কথার মানে খুঁজতে বসছ? যাক এবার কিন্তু কিন্তু আর ঘোরা নয়। তুমি আর পঞ্চু কিছু খেয়ে নাও। তারপরই সোজা হাওড়া স্টেশন!

আর তুমি?

আমি? আমার তো তোমার ওই আইসক্রীমটা খেয়েই পেট ভরে আছে। সেটা আমরাও খেয়েছি।

কী মুস্কিল! তোমাদের সঙ্গে আমার তুলনা? কী রে পঞ্চু খিদে পায় নি?

পঞ্চু গম্ভীরভাবে বলল দাদাবাবুর পেলে পঞ্চুরও পেয়েছে, নচেৎ নয়।

পঞ্চুরে তুই মরা মানুষকেও হাসাতে পারিস।

স্টেশনে এসে পৌঁছে চিত্ত ভয়ানক একটা অস্থিরতা অনুভব করে। সারা-দিন যেন একটা ছায়াছায়া ঘোরে ছিল, এখন রোদের মুখোমুখি হলো।

বেশ ! টুনু এখন ?

এখন ? এখন ট্রেন দিলে উঠে পড়া।

হুঁ। তারপর ?

তারপর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রুমাল নাড়া।

ওঃ ! তারপর ?

তারপর কু ঝিকঝিক কু ঝিকঝিক শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়া।

ঘুমিয়ে পড়া ! অবশ্য তোমার মুখেই মানায় এ কথা।···কিন্তু আমার তো যাওয়া হতে পারে না।

যাওয়া হতে পারে না !

না ! কিছুতেই না। এভাবে, এই রাত্তিরে তোমাকে এই প্লাটফর্মে একা দাঁড় করিয়ে রেখে—না না ! অসম্ভব।

একা কী গো ? পঞ্চু রয়েছে না ? ওকে বুঝি দেখতে পাচ্ছো না ?

পঞ্চু ! ওঃ তাইতো।

ওভাবে বলছ যে ? পঞ্চু বুঝি একটা মানুষ নয় ? ও আমায় ঠিক ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

পঞ্চুর ভরসায় তোমায় এই রাত্তিরে হাওড়া স্টেশনে ! সম্ভব নয়, সম্ভব নয়।

টুনু কিছু বলতে যাচ্ছিল, এই সময় হাঁপতে হাঁপাতে প্রায় ছুটতে ছুটতে গৌতম এসে পৌঁছল। বলে উঠলো, গুড গড্। দেখতে পেলাম তোকে। যা দেরী হয়ে গেল ! শালার বাসগুলো আজকাল— আরে পঞ্চু ? টুনুও। তোমরা এসে গেছ। অদ্ভুত তো। চিত্ত তোর জিনিসপত্র ? এই সুটকেসটা ? এই ভয়ঙ্কর অস্থির মুহূর্তে গৌতমকে দেখে কি হাতে চাঁদ পেল না চিত্ত ? তবু—সঙ্গে সঙ্গেই ভিতরে একটা প্রবল আলোড়ন উঠলো চিত্তর। অনুভব করল মনের মধ্যে এক দুরন্ত উল্টো হাওয়া। ভয়ানক একটা অপমান বোধে জ্বলে উঠলো যেন। কে যেন হঠাৎ ওর গালে ঠাশ করে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছে।

ওঃ তাই ! তাই মহারাণীর এত সাহস। আগে থেকে ঠিক করে রাখা হয়ে-

ছিল। নিশ্চয় লুকিয়ে চিঠি ফিটি লিখে—না কি টেলিগ্রাম করে।
চিন্তাটা যে অবাস্তব, চিত্তর অজানতে চিঠি লেখা, (অথবা আরো এক-কাঠি এগিয়ে) কি টেলিগ্রাম করা টুনুর পক্ষে সম্ভব কি না, সেটা খেয়ালে এলো না। টুনুর দিকে একটা বাঁকাহাসির সঙ্গে একটা বিষবাণ ছুঁড়ে দিলো, ওঃ তাই ! তাই এত সাহসিকার ভান। কত ন্যাকামিই করলে সারাদিন। তবে ব্যাপারটা আমায় জানালে এমন কিছু ক্ষতি হতো না। বরং নিশ্চিন্তই হতাম। কিন্তু যাক, খুবই দুঃখের বিষয় গৌতমবাবু, আপনি একটু আগে আগে এসে পড়লেন।
গৌতম বিমূঢ় হলো।
চিত্তর ব্যঙ্গবাণীর অর্থ ঠিক ধরতে পারল না। বলল, আগে কীরে ? দেরীইতো হয়ে গেল। ট্রেনতো ছাড়ল বলে। হতচ্ছাড়া বাসটার জন্য—
তেতো গলায় বলে উঠলো চিত্ত, আহা। আসলে কথা তো ছিল ট্রেন ছাড়ার পরে আসার ! তাই না ?
কী আবোল তাবোল বকচিস ? ট্রেন ছাড়ার পরে আসার কথা ?···ওঃ রাগ! অভিমান! বললামতো শালার বাসটাকে এমন 'জাম'-এ ধরল। তার-ওপর আবার প্ল্যাটফরম টিকিট কিনতে—
ওঃ ! তার মানে বোঝাতে চাইছ তুমি আমায় 'সি অফ্' করতেই এসেছ যাদু ?
গৌতম হতবুদ্ধি গলায় বলে, তোকে না তো কাকে ?
থাক থাক যথেষ্ট হয়েছে। বেশী ছলাচাতুরীতে দরকার নেই।···যাক কালই বোধহয় ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে নোটিশ দিতে যাচ্ছিস ?
টুনু এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন বলে উঠলো, চিত্ত, আর বেশী জ্বালিও না, শেষে নিজেই অনুতাপের জ্বালায় দগ্ধাবে।
জ্বালাব না ? আর বেশী জ্বালাব না ? অনুতাপে দগ্ধাব ? তার মানে ধরে নিতে হবে গৌতম শালা হাত গুণে জেনে ফেলেছে চিত্তটা আজ এই ট্রেনে বিদেয় হচ্ছে।
কী আশ্চর্য ! হাত গুনবার কী হলো ? তুই সেদিন বললি না ষোল তারিখে

জয়েনিং ডেট্, চোদ্দ তারিখের জন্যে 'রাজধানী'র টিকিট কাটতে দিয়েছিলাম, ব্যাটা টিকিট কেটেছে 'কালকা'র।

চিত্তও অপ্রতিভ হলো। কারণ মনে পড়ল কথাটা।

বলল, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আচ্ছা আমি উঠে পড়ছি। তুই তাহলে এদের সঙ্গে রইলি ? ও কে। টুনু তোমার নতুন জীবন সুখের হোক।··· গৌতম থ্যাঙ্কু।···

উঠে পড়ল কামরায়। যার দরজায় এক নারকীয় ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি চেঁচামেচি। বুঝতে পারা যায় না পরিচিত মানুষটা ওই জনারণ্যের মধ্যে কোথায় কোন্‌খানে ঢুকে পড়ল আশ্রয় পেল।

ওই ঠেলাঠেলির মধ্যেই গাড়ি ছেড়ে দিলো।

কুলিরা হুদ্দাড় করে নেমে পড়ল।

মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ তিনটে ব্যাকুল চোখে জানলাগুলোর দিকে চোখ ফেলতে চেষ্টা করতে থাকে, দেখতে পায় না সেই পরিচিত প্রিয় মুখখানা। দেখতে পায় না রুমাল নাড়া। হয় তো কোনো জানলার কাছে আসতেই পায় নি।

ট্রেনের দীর্ঘ অজগর দেহটার চলে যাবার পরও তিনজনেই একটু যেন বিহ্বল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থেকে প্রথম কথা বলল গৌতম। বলল, ওর মনটা দারুণ খারাপ হয়ে রয়েছে দেখছি।

পঞ্চুর গালের উপর দিয়ে অনেকক্ষণ থেকেই জল গড়িয়ে চলেছিল, পাছে মুছতে গেলে অন্যের চোখে পড়ে যায়, তাই হাত তুলে মোছে নি। এখন মুখটা ঘুরিয়ে কাঁধে ঘসে সেই চিহ্নটা কিছুটা কমিয়ে আস্তে বলল, মুকটাই ফটফটে প্রাণটাতো মায়ায় ভরা।

আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে ওরা প্লাট্‌ফরম থেকে, টুনু বলল পঞ্চু, বোতলের শরবৎ খাবি ?

পঞ্চু জোরে মাথা নাড়ল।

টুনু !

গৌতম গম্ভীর গলায় বলল, চিত্তটাতো কী এক ভুল ধারণা করে যা তা

বকে গেল, আসলে কী ঠিক ছিল তোমার বলতো ?

টুনু যেন হঠাৎ আবার অন্য জগতে চলে গিয়েছিল। চমকে, বলল, কিসের ঠিক ?

মানে, এখন রাতটা কোথায়—

টুনুর আগে পঞ্চুই বলে উঠলো, সে ব্যাবোস্তা হয়ে আচে। রেতে দিদি আর আমি ওই 'ওয়েট ঘরে'র মদ্যে সেঁদিয়ে জেগে জেগে বোস করে থাকবো, ভোরের বেলা তেঙ্গুটির য্যাতো বেপারিরা আসবে অনেকে চেনা-চেনা তো, তাদের সাতে সেঁটে যাব। তা'পরগে, তাদের সাতেই বসে গাড়িতে চেপে —চলে যাব সাজা তেঙ্গুটি। তা'পরগে হেঁটেহেঁটে জলটুভি।

বাঃ। একেবারে পরিষ্কার সফরসূচি। কিন্তু টুনু 'ওটেং ঘরে' জেগে ফেগে বোস করে থাকার তো কোনো মানে হয় না। চল, বেরিয়ে পড়ে দেখা যাক, কী করা যায়।

টুনু বলল, না না, ও নিয়ে আর তোমায় ভাবতে হবে না। পঞ্চু ঠিক ম্যানেজ করে নেবে।

গৌতম হাঁটতে হাঁটতেই একটু কাছাকাছি সরে এলো, পঞ্চুর কান বাঁচিয়ে বলল, দয়া করে যখন তোমার বাকি সারাজীবনের ভাবনার ভারটা দিয়েছ এই ভাগ্যকে, তখন সেটা এখন থেকেই হোক না ?

টুনু একথার উত্তর না দিয়ে হঠাৎ বলে উঠলো, পঞ্চু তোর খিদে পায়নি ?

ক্যানো ? এই তো খানিক আগে দাদাবাবুর সাতে হোটেলে খাওয়া হলো।

তা' হোক। সারারাত তো থাকতে হবে ?

আহা ! পঞ্চার য্যানো ঘড়ি ঘড়ি খাওয়ার অব্যেস।

তা' না হোক। এখানে যখন চারদিকে এতো খাবার। আরে আরে গৌতম, ওই টফি কেনো তো চারটি।

পঞ্চুর বিভ্রান্তদৃষ্টি ওই লোভনীয় 'ঠ্যালাগাড়ির দোকানগুলোর ওপর বার-বারই আছড়ে গিয়ে পড়েছে, আসার সময়। এখন পড়ছে কী অলৌকিক সুন্দর দৃশ্য।

গৌতম একরাশ টফি লজেন্স আর বাদাম তক্তি এনে বলে এধারে এই বেঞ্চিটায় বোসো পঞ্চু, ধীরে ধীরে খাও। আর তো এখন তাড়া নেই কিছু ?

আপনি বাড়ি ফিরবেন না ?

গৌতম হেসে বলল, নাই বা ফিরলাম। তোমাদের সঙ্গে নয় জেগে জেগেই বোস করে কাটিয়ে দেবো। এখন ওই বইয়ের দোকানটা দেখি একটু।

এগিয়ে গেল। যেতে যেতে বলল, টুনু তু একটা বই বেছে নেবে তো নাও। পঞ্চু উঠো না এখান থেকে। আসছি।

বইয়ের স্টলটার সামনে দাঁড়িয়ে গৌতম গাঢ় গভীর গলায় বলল, এবার তো আমার আবেদনের জবাবটা দিতে পারো টুনু।

জবাব ?

টুনুর মুখে একটু করুণ কোমল অথচ কৌতুকের হাসি ফুটে উঠলো। বলল 'জবাব' কথাটার আরও একটা মানে আছে জানো তো ?

গৌতম চকিত হয়ে তাকিয়ে দেখল।

টুনু বলল, জানো না ? লোকে বলে আজ থেকে ওর চাকরিতে 'জবাব' হয়ে গেল।

গৌতম বলল, সেই 'জবাবটা'ই কি দিতে চাইছ ?

টুনুর স্বরও গাঢ় হলো। বলল বলতে কষ্ট হচ্ছে, তবু বলি ঠিক তাই। চিত্ত তোমায় যে চাকরিটার আশ্বাস দিয়ে রেখেছে, তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা আর তুমি পাচ্ছ না।

এটাই শেষ জবাব ?

'জবাব' মানেই তো শেষ গৌতম।

গৌতম অকারণ একখানা হিন্দি বই ওলটাতে ওলটাতে বলল, জানতাম ! আমি জানতাম।

গলাটা কেঁপে গেল ওর। আবার বলল, চিত্তটার সঙ্গে ওই ট্রেনে উঠে যাওয়াই উচিত ছিল তোমার।

টুনু ওর বইধরা হাতটার ওপর আলতো করে একটা হাত রেখে মৃদু গলায়

বলল, ওটা তোমার ভুল ধারণা গৌতম। চিত্তকে বাঁচাতে এই ছলনাটুকু করতে হলো আমার। তার বেশী নয়। ওকে না তাড়ালে পাগলা হয়ে যেত। আর তাড়াবার আর কী উপায় ছিল বল? অকারণ তোমায় খানিকটা কষ্ট দিলাম।···একটু হাসল। বলল, তোমার বাড়িতে কী পরিমাণ ঝড় উঠেছে, কী পরিমাণ গঞ্জনা খেতে হয়েছে তোমায়, অনুমান করছি, তবে জানতাম তো সব ঠিক হয়ে যাবে।

সব ঠিক হয়ে যাবে?

গৌতম শ্লেষের গলায় বলে উঠলো, জীবনটা তোমার পঞ্চুর সফরসূচি নয় টুনু। সব কি ঠিক হয়ে যায়?

যায় গৌতম, টুনু ব্যগ্রভাবে বলে ওঠে, যায়। যাবে। আমি বলছি গৌতম, আমার একটু বোকামিতে তোমার খানিক কষ্ট হলো। কিন্তু কী করব বল, একবারও তো চিত্তর অসাক্ষাতে তোমার সঙ্গে দেখাই হলো না যে তোমাকেও আমার ষড়যন্ত্রের সঙ্গী করে নেব। তোমার যা ক্ষতি করবার করেছি, ক্ষমা করে দাও গৌতম। চিত্ত তো তোমারও বন্ধু!

গৌতম হঠাৎ যেন ফস্ করে জ্বলে ওঠে। চাপা আক্রোশের গলায় বলে, যদি না করি? যদি দাবি না ছাড়ি? তুমি আমার স্থির শান্ত জীবনটাকে তচনচ করে দিয়েছ। আমাকে আমার পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছ, সবাই জেনে গেছে, সবাই ছি ছি করছে, এখন 'জবাব' বললেই জবাব হয় না।

টুনুর মনের নিভৃতে একটু হাসির ছায়া উঁকি মারল।·· অসতর্ক উক্তি! 'সবাই ছি ছি করছে।' ছি ছি করবে করছে এ কথা তো জানতোই টুনু। তবু নিশ্চিন্ত ছিল। জানতো এ আঘাত যাত্রা পালার টিনের তলওয়ারের বই তো নয়।

যেই টুনু অভিনয়ের মঞ্চে যবনিকা টেনে দেবে সেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আস্তে হেসে বলল, সারাজীবন সেই ছিছির ভারে দুর্বহ ভারাক্রান্ত জীবনটা থেকে মুক্তি পাচ্ছো, এতো তোমার ভালই হবে গৌতম।

থাক! আমার 'ভালর' চিন্তা তোমায় করতে হবে না। শুধু জানতে চাই

অতঃপর তোমার ব্যবস্থাটা কী ? স্মৃতিটুকু বুকে ধরে জীবন কাটানো শুনতে যতই কাব্যিক হোক প্র্যাকটিক্যাল নয়।

আবার তুমি সেই ভুল ধারণাটা আঁকড়ে ধরে বসে আছ গৌতম। তাই যদি হতো, স্মৃতিটুকু আঁকড়ে পড়ে থাকবার কী দরকার ছিল আমার ? মানুষটাকে আঁকড়েই ট্রেনে চড়ে বসতে পারতাম। আমার কোথায় কী লোকসান হতো ? কে বাধা দিতে আসত আমায় ? 'ছি ছি' করবার মতোই কি আছে কেউ আমার ?

অকারণ বই ওলটানো দেখে স্টলের মালিক চঞ্চল হচ্ছিল। মনে হচ্ছে টফির প্যাকেট হাতে পঞ্চুও চঞ্চল হচ্ছে। গৌতম দুটো ইংরিজি বই কিনে নিল। হাতে নিয়ে একটু সরে এলো, টুনুর হাতে দিলো একটা।

টুনুর কথাটা প্রণিধানযোগ্য। কে বাধা দিত ওকে ?

কিন্তু চিত্তকে বাঁচাতে টুনু, গৌতম নামের বাঁদরটাকে একটু নাচিয়ে নিল, এটা ভেবে খুব খারাপ লাগছে। খুব অপমান হচ্ছে। সেই আহত অভিমানের গলায় বলে উঠলো গৌতম, লোকে যখন একটা ডিসিশান নেয়, নিজের 'ওয়ে থেকেই দেখতে পায়, তাই দেখে।···আমার ক্ষতির হিসেব করবার ক্ষমতা তোমার নেই টুনু। থাকলে হয়তো একবার—

গৌতম, আমি বুঝতে পারছি। তবু বলছি, এতে তোমার ভালই হবে। আর যদি তা নাও হয়, মনে কোরো একটা দুঃখী মেয়েকে দয়া করতে, নিজের অনেকটা ক্ষতি সয়ে নিয়েছ। তাকে তার নিজের জীবনটা নিজের মতো থাকতে সহায়তা করেছ। তুমি আমার মস্ত বন্ধু গৌতম।

ঠিক আছে। ধন্যবাদ। কিন্তু নিজের মতোর নক্সাটি কেমন, জানতে চাইবার অধিকার পেতে পারি কি ?

ওমা ! এতো পোষাকী করে বলছ কেন ? বললাম না বন্ধু। নক্সা ? নক্সাতো দেখেই এসেছ। সেই আমার 'জলটুভি', ওই পঞ্চু, আর তার তেতো শশার চাষ, এবং ডুমুরের পাঁচন।

একটা দীর্ঘশ্বাস বাতাসে হারিয়ে গেল।

আর একটা ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে এসেছে, আবার চলছে হুড়োহুড়ি

ঠেলাঠেলি, চেঁচামেচি লোকে ধাক্কা দিয়ে চলে যাচ্ছে। কুলিরা লোকেদের বিশাল বিশাল ট্রাঙ্ক সুটকেসগুলো অন্যলোকেদের মাথায় কপাল ঠুকে দেবার জন্যেই যেন বদ্ধপরিকর হয়ে ছুটছে।···শব্দ যে 'ব্রহ্ম' সেটা এই হাওড়া স্টেশনে এলে যেমন টের পাওয়া যায়, তেমনটি বোধকরি আর কোথায়ও নয়। আলাদা আলাদা করে কারো কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না, শুধু যেন একটা ওঙ্কারের হুঙ্কার ধ্বনি।

খুব কাছাকাছি সরে আসা ছাড়া কথা বলার কোনো উপায় নেই। তাই আসতে হলো।

এই জীবনটাই তোমার ইচ্ছের নক্সা? এই নক্সাটাই বেছে নিচ্ছ তুমি? নিচ্ছিতো—

জনারণ্যের প্রাচীর ভেদ করে পঞ্চুকে আর দেখা যাচ্ছে না।

গৌতম পাশ থেকে টুনুর একটা কাঁধ চেপে ধরে বলে, মিনতি করছি টুনু একটা খেয়ালের খেলায় জীবনটাকে পণ ধরো না। জলটুভির সেই জীবন? সেইটাই চিরদিনের আশ্রয়? এ জীবনের কোনো মানে হয়?

টুনু আস্তে নিজের কাঁধটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, জীবনের মানে কি শুধু একই রকম গৌতম? তার তো অনেক দিক, অনেক স্বাদ!···জলটুভির সেই খোলা আকাশ, অদ্ভুত সুন্দর বাতাস, মাটির কুঁড়ে, দৈন্য দারিদ্র্য অভ্যস্ত সব কিছুর অভাব, আর একটা অবোধ ছেলের নিপাট বোকামির অকপট খাঁটিত্ব, জীবনের এক আশ্চর্য মানের সন্ধান এনে দিয়েছে আমায়। ওখান থেকে চলে আসা আর এখন ভাবতেই পারি না আমি।···

হাসল একটু।

বলল, আমার বাড়িওলা গার্জেন আশ্বাস দিয়েছে, এবার ও ওর উঠোনে ফুল ফোটাবে। ফলের লতাগাছ দিয়ে বেড়ার 'বিচ্ছিরিটা' ঢেকে দেবে। মাঝে মাঝে যেতে হবে কিন্তু গৌতম। নাহলে হয়তো হঠাৎ হঠাৎ প্রাণ হাঁপিয়ে উঠবে। আর বিয়ের পর বৌকে নিয়ে এসে দেখিয়ে যাবে তো নিশ্চয়।

হুঁ! আর কি কি হুকুম আছে?

আর ?

টুনু দ্রুত্তলতে চলতে একটু তুষ্ট হেসে বলে, আর ? চিরদিন যা ইচ্ছে হুকুম কার অধিকারটা বজায় রাখতে হবে। বাস! আর কিচ্ছু না। কীরে পা? আর পারলি না? উঠে আসছিস?…চল চল এবার তোর ওটেংঘরে ঢুইগে। গৌতম এবার কেটে পড়। এরপর আব বাস পাবে না।